শৈল-ভবন

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

BENGALIEBOOK.COM
★2022★

সূচিপত্র

1..........2
2..........15
3..........32
4..........47
5..........61
6..........76

1

দুই বন্ধু—অজয় আর সমর। যারা দেখে, তারাই বলে, আহা, যেন এক বৃন্তে দুটি ফুল, উপমাটা নিতান্ত সাবেকী। অজয় আর সমর হাসে। কৃপার হাসি। বন্ধুত্বটা তাদের হাওয়ার দোলায় দুলে শুধু বাগানের শোভা বর্ধনই করে না; শেকড় তার মাটির অনেক গভীরে। ক্লাস ফাইভে একদিন তারা পড়ল: উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্র বিপ্লবে। রাজদ্বারে শ্মশানে চ যঃ তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ ॥

পেছনের বেঞ্চে বসে এখনই সমর পকেট থেকে পেন্সিল কাটা ছুরিখানা বার করল। পেন্সিল কাটা করেই কাটল বাঁ-হাতের তর্জনী। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। শিউরে উঠল অজয়। সমরের মুখে কিন্তু অমলিন হাসি। ধীর কণ্ঠে বলল, চাণক্য পণ্ডিত বাজেবাজেই লেখেননি রে। রক্ত ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর, উৎসবে, ব্যসনে, শ্মশানে, রাজদ্বারে—যেখানেই হোক, আমরা কেউ কাউকে ফেলে পালাব না। একজন আর একজনের পাশে এসে দাঁড়াব।

প্রতিজ্ঞা করল অজয়। মনে বিচিত্র এক উত্তেজনা, রক্তে উন্মাদনার ঢেউ। সেদিন অলক্ষ্যে বসে বিধাতা বোধ করি হাসলেন।

স্কুলের গণ্ডী একসঙ্গেই পেরোল তারা। ভর্তি হল একই কলেজে। অবশ্য অজয় নিল কমার্স। তার বাপ রমেন সেনের বিরাট সওদাগরী অফিস। ফলাও ব্যবসা। ভবিষ্যতে

অজয়কে বাপের শূন্য সিংহাসনে বসতে হবে। আর সমর গিয়ে ভর্তি হল সায়েন্স ক্লাসে। ডাক্তার হতে হবে তাকে। আগ্রহ তার নিজের যতখানি, তার চেয়ে অনেক বেশি তার অভিভাবকদের।

যে ধারা এতকাল ছিল একমুখী, তাই হল দ্বিমুখী। চাণক্য পণ্ডিত বন্ধুর যাচাইয়ের যে কষ্টিপাথর রেখে গেছেন, তাতে যেন প্রথম চিড় দেখা দিল।

দিল উৎসবে, ব্যসনে। অজয় সান্ধ্য ক্লাসে পড়ে। সমরের ক্লাস সকালে। তাই ছুটিছাটা বা রবিবার ছাড়া দেখা-সাক্ষাৎ তাদের বিরল হয়ে উঠল। অজয়দের বাড়ির অত বড় বার্ষিক উৎসবে সমর যেতেই পারল না। সন্ধ্যায় নিত্য সাউথ ক্লাবে গিয়ে টেনিস খেলাও অজয়কে বন্ধ করে দিতে হল।

হোক, তবু এমনি ভাবে হোঁচট খেতে খেতে তার ছাত্রজীবন পার হল।

এর পর সংসার জীবনে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে পাথরের বুকে দেখা দেওয়া চিড়টা আরও অনেকখানি বেড়ে গেল।

পাস করার সঙ্গে সঙ্গেই অজয়ের বাপ ছেলেকে অফিসে নিয়ে গিয়ে বসালেন। একা বোধ করি সব দিক আর সামলাতে পারছিলেন না তিনি। মৃদু আপত্তি জানিয়েছিল অজয়, আর কটা দিন যাক বাবা। সমর ডাক্তারীটা পাস করে বেরুক...

থামিয়ে দিয়েছিলেন রমেন সেন। চোখের চশমাটা নামিয়ে রেখে কতক্ষণ ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছিলেন; বলেছিলেন, আজকের দিনে বন্ধুত্ব নিয়ে কেউ জাহির করে না। আসলে ওটা একজাতীয় আত্মসচেতনতা। দায়িত্ব এড়ানোর মনোবৃত্তিও বলতে পারো।

এর পর অজয় আর একটি কথাও বলেনি। পরদিন থেকেই গলায় টাই এঁটে, সাড়ে নটার সময় অফিসে হাজিরা দিতে শুরু করল।

তবু অবসর পেলেই সে ছুটে আসত সমরের হোস্টেলে। তার ঘরে ঢুকে খোলা বইপত্রগুলো গুটিয়ে দিত। হুকুম করত, চা আনা, খাবার আনা। আলোটি নিভিয়ে দে। তারপরই এখানে তক্তপোশটার ওপর সবসুদ্ধ গড়িয়ে পড়ে বলত, ডি.ই আর ডি.টি-তে কোন তফাৎ নেই রে। জীবনে দুটোই মারাত্মক ব্যাধি।

সমর কথা বরাবরই কম বলে। আত্মবিশ্বাসটা বেশি বলেই সব রকমের হৈচৈ এড়িয়ে চলে। খাবার সে সেদিনও আনাল, প্রচুর পরিমাণেই আনাল। নিজের হাতে চা তৈরি করে বন্ধুকে দিল; কিন্তু আলো নেভাল না। মৃদু কণ্ঠে বলল, ভুলে যাসনি, সামনে আমার এগজামিন।

ধড়মড় করে উঠে বসল অজয়। চা আর খাবারের সদগতি করতে করতে কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করে বলল, নদীর একপাড় ভাঙে, আর একপাড় জাগে, জানিস তো। তোর জন্যেই হয়তো এর পর বিয়ে করে বসব।

সমরের ঠোঁটের কোণে শুধু একটু হাসি দেখা গেল। কোন কথা বলল না। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে অজয় শাসনের সুরে বলল, তোর এই introvert স্বভাবটা ছাড়, সমর, নইলে রোগীর গায়ে যে ছুরি বসিয়ে হাত পাকাচ্ছিস, সেই ছুরিই একদিন নিজের বুকেই বসাবি।

মচমচ করে জুতোর শব্দ তুলে বেরিয়ে গেল সে।

হেসে সমর গুটানো বইটা আবার তুলে নিল। এমন অভিযোগ অজয় বহুবার করেছে, কিন্তু সে জানে, হাওয়ার মুখে পাল তুলে দিলে, জীবনতরী তার ঠিক ঘাটটিতে কোনদিনই ভিড়বে না। প্রতিটি মুহূর্তে তাকে শক্ত হাতে দাঁড় টানতে হবে। প্রতিকূল স্রোতের বিরুদ্ধে তিলে তিলে এগোতে হবে। অতি বড় প্রয়োজনের মুহূর্তেও কেউ গুণ টেনে কূলে ভেড়াবে না।

অবশেষে একদিন সে ডাক্তার হয়ে বেরোল। শল্য চিকিৎসক। অস্ত্রোপচার করত সে সাবলীল ভঙ্গিতে, অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে। যেটুকু সুনাম সে পেয়েছিল, সেইটুকু মূলধন নিয়েই শহরের প্রাণচঞ্চল পাড়ায় এক চেম্বার খুলে বসল। দরজার পাশেই নেমপ্লেট আটল, সমর রায়, সার্জেন।

মেধাবী ছাত্র ছিল সে। বছরের পর বছর পরীক্ষার ফল যত ভাল হয়েছে, আত্মবিশ্বাসও গেছে সেই অনুপাতে বেড়ে। রোগীর আশায় নিয়মমাফিক চেম্বারে বসে থাকতে থাকতে কোনদিন সে হতাশায় ভেঙে পড়েনি।

হাত ধরে পশারের তোরণদ্বারে পৌঁছে দেবে, এমন কোন শুভানুধ্যায়ী তার ছিল না। ভিড়ের মাঝে হারিয়েও গেল না সে।

না-যাবার সব কৃতিত্বটুকু তার নিজেরই। চিকিৎসাটাকে সে একান্ত পেশাদার বৃত্তি করে তোলেনি। রোগীর পকেটের দিকে না তাকিয়ে, রোগের জড় ধরেই টান দিত সে। কথা বলত কম, ব্যবহারে থাকত প্রশান্ত হাসির বরাভয়।

তাই একবার যে রোগী আসত, সে দ্বিতীয়বার আসতে দ্বিধা তো করতই না; বরং আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবকে ডাক্তার রায়কে দিয়ে দেখাতে সুপারিশ করত।

নিন্দার মত প্রশংসাটাও বুঝি দাবানলের মতই ছড়িয়ে পড়ে। নইলে সকাল সন্ধ্যায় সমরের চেম্বারে রোগীর ভিড় বাড়তেই বা থাকবে কেন? নিয়মানুবর্তিতার বাঁধন শিথিল হয়ে গেল। বিশ্রামের অবকাশ গেল কমে। সব দিন সময়মত সমরের খাওয়াও হয় না। রাতের ঘুম বিঘ্নিত হয় টেলিফোনের ঝন্‌ঝন্‌ আওয়াজে।

অজয়ের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎটাও বিরল হয়ে উঠল। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় বন্ধুত্বের স্রোতে এবার ভাটার টান ধরেছে।

অফিস থেকে অজয় মাঝে মাঝে টেলিফোন তুলে অনুযোগ করে, নালিশ জানায়; তারপর হঠাৎই একদিন রাত্রে ধূমকেতুর মত এসে হাজির হয় সমরের চেম্বারের। অভিমানের বাঁকা সুরে বলে, পর্বত তো গেল না, তাই মহম্মদকেই ছুটে আসতে হল।

অভ্যর্থনায় সমরের অকারণ উচ্ছ্বাস থাকে না। কিন্তু সেই মুহূর্তে পেশার জোয়ালটাকে নামিয়ে ফেলতে দেরি হয় না তার। সামনাসামনি গদিমোড়া চেয়ারে বসে তারা শুরু করে দেয় খোসগল্প। পেয়ালার পর পেয়ালা কফি আনে ভৃত্য রামলগন। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলে। খোসগল্প একসময় এসে দাঁড়ায় স্মৃতিচারণে। তারপর রাজনীতি থেকে সমাজনীতি, অর্থনীতি থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞান নিজেদের অগোচরেই পরিক্রমা করে চলে তারা। মাঝে মাঝে তর্ক তাদের উদ্দম হয়ে ওঠে। বাড়ি ফেরার কথা মনে থাকে না অজয়ের। অবশেষে ভোরের আলো জানলার শার্সি দিয়ে দেখা গেলে সমর অকস্মাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলে, আর নয়, বাড়ি যা অজয়। চান করে এবার আমায় চেম্বারে বসতে হবে। নটায় একটা অপারেশন।

অজয়ের হুঁশ হয়। রাত জাগার ক্লান্তিটা এতক্ষণে যেন সর্বাঙ্গ ব্যেপে ছড়িয়ে পড়ে। অবসন্ন দেহটা টানতে টানতে সে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে, আর তখনই দেখা যায় শুভ্রবসনা মায়াকে ওপরে উঠতে। মায়া মানে কুমারী মায়া দে। নার্স। সমরের ক্লিনিকে কাজ করে। আগে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ছিল। সমরের সঙ্গে পরিচয়টা সেইখান থেকেই।

ডিউটি দিতে যেতে হত সমরকে। আরও অনেক ছাত্রই যেত; কিন্তু রোগীদের ওপর তার দরদ, রোগনির্ণয়ের ক্ষমতা, মিষ্টি মধুর ব্যবহার চুম্বকের মতই টানত মায়াকে।

সহকর্মিণীদের কাছে সেটা বেশিদিন গোপন থাকেনি। সুযোগ পেলেই তারা ঠাট্টা করত, বিদ্রূপ করত, শ্লেষের চাবুক চালাত। শেফালি নাগই ও ব্যাপারে বোধ করি সবচেয়ে নির্মম ছিল। একটা দিনের কথা মায়া কখনও ভুলতে পারবে না। রাতের ডিউটি ছিল মায়ার আর সমরের। সারাক্ষণের মধ্যে একটিবারও তারা একান্ত হয়নি, অকারণে বাক্যবিনিময়ও করেনি; শুধু বারদুয়েক সমরের চোখে কৃতজ্ঞ দৃষ্টি ফুটে উঠেছিল।

অনাস্বাদিত এক পুলকে ভরে উঠেছিল মায়ার সারা অন্তর। সেইটুকু সঞ্চয় নিয়েই সে ফিরেছিল হোস্টেলে।

সামনের দালানটায় তখন চায়ের কাপ নিয়ে মজলিশ চলছিল। শেফালি নাগ তাকে দেখে টেনে টেনে বলে উঠেছিল, আহা। মায়ার আমাদের ধর্মে পাপ সয় না। আমরা ভাই পাপী-তাপী মানুষ। মনের মানুষ পেলেই লেপটে থাকি। প্লেটনিক লাভের কি বুঝব, বল।

সব কজনের কণ্ঠে হাসির জলতরঙ্গ বেজেছিল। লজ্জা অপমানের হাত থেকে রেহাই পেতে মায়া তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ঢুকে আত্মগোপন করেছিল।

আর একদিন ধরেছিল দীপা চৌধুরী। ডাক্তারির শেষ পরীক্ষা আসন্ন। পাস যে সমর করবে, ভালভাবেই করবে, তাতে কারোই সন্দেহ ছিল না। সেইটে উপলক্ষ্য করেই দীপা নিরীহের ভঙ্গিতে মায়াকে প্রশ্ন করেছিল, এবার কি করবি? ঘুঘুর বাসা তো পুড়তে চলল!

মায়া কোন জবাব দেবার আগেই শেফালি উচ্চকণ্ঠে বলে উঠেছিল, না ভাই মায়া, শেষ কটা দিন তুই এমনভাবে সমর রায়ের বুকে জুড়ে থাক, যাতে ও ফেল করে। তবু তো ছটা মাস বিরহের কান্না কাঁদতে হবে না।

মায়ার বুকটা ভয়ে কেঁপে উঠেছিল। ছুটে নিজের ঘরে এসে সে আকুলভাবে প্রার্থনা জানিয়েছিল, ভগবান, সমরবাবু যেন পাস করেন। সারা জীবন যদি আমার সঙ্গে দেখা না হয় সেও সইবে, কিন্তু

সমর অবশ্য পাস করল। ভালভাবেই করল। শীর্ষস্থানে নাম তার।

তারপর ঘনিয়ে এল বিদায় নেবার দিন। চেষ্টা করেও মায়া চোখের জল গোপন করতে পারল না। সমরের একখানা হাত চেপে ধরে ব্যাকুল কণ্ঠে বলল, কিন্তু আমি এখন কি করব, ডাক্তার রায়। আপনি যতদিন কাছাকাছি ছিলেন, নিজেকে যে কতখানি নিরাপদ ভাবতুম, এর পর-এর পর হয়তো—নেকড়ের পাল—। গলাটা তার বাষ্পভারে বুজে এল।

সেদিন সমর শুধু সান্ত্বনাই দিতে পেরেছিল, নির্ভয় করতে পারেনি।

তারপর সে নিজের চেম্বার খুলল। দাঁড়াবার মত পায়ের তলায় একটু মাটি পেতেই সোজা মায়ার কাছে গিয়ে প্রস্তাব করল, আমার ক্লিনিকের একজন নার্স তো লাগবেই। যদি ইচ্ছে করেন, চলে আসতে পারেন। অবশ্য মাইনে এখন বেশি দিতে পারব না। কোন রকমে থাকা-খাওয়াটা চলে যাবে, এই আর কি।

এতখানি সৌভাগ্যের কথা মায়া বোধ করি কল্পনাও করতে পারেনি। কাঁপা গলায় বলল, মাইনের কথা বলে কেন আমায় লজ্জা দিচ্ছেন, ডাক্তার রায়? আপনার যা খুশি দেবেন। মোটে না দিলেও আমার আপত্তি নেই। হাতে যা আছে, তাতে কিছুদিন স্বচ্ছন্দে চলে যাবে। শুধু এই নরককুণ্ড থেকে আমার উদ্ধার করে নিয়ে চলুন।

.

পরদিনই মায়া হাসপাতালের চাকরিতে ইস্তফা দিল। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও সমরের মতই চেম্বারের এক কোণে তার নীড় রচনা করতে পারল না। শুধু যে সঙ্কোচে বাধল, তাই নয়; সমাজের চোখেও সেটা বিসদৃশ।

তবু কতটুকুই বা হোস্টেলে থাকত সে? সকালে এসে যখন হাজিরা দিত, তখনও শহরে প্রাণের সাড়া জাগত না। ফিরত একেবারে গভীর রাতে। কর্মচঞ্চল শহর তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। হাতে সব সময়ই কিছু ক্লিনিকের কাজ থাকত না; তবু বসে থাকত না মায়া। সমরের প্রত্যেকটি বই ঝেড়ে-মুছে আলমারিতে সাজিয়ে রাখত, ঘরের কোন কোণে

এতটুকুও ঝুল আছে কিনা ঘুরে ফিরে নিরীক্ষণ করত; ফাঁক পেলে সমরের চাকরটাকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই ভালমন্দ রাঁধতে বসত।

মাঝে মাঝে হঠাৎ অসময়ে ফিরে আসায় সমরের নজরে সেগুলো পড়েছে। মৃদু তিরস্কারও করেছে মায়াকে, অব্যাপারেষুতে লাভ নেই, মিস দে। হাতে কাজ না থাকে, পড়াশুনোও তো করতে পারেন।

কোন জবাব দিত না মায়া। ধীরে ধীরে সরে যেত তার সামনে থেকে। ছটা মাস এমনিভাবেই পার হয়ে গেল। এই ছমাসের চেম্বারে রোগীর ভিড় বেড়েছে, সমরের বিশ্রামের অবকাশ কমেছে, সেই সঙ্গে তার দুই চোখে দেখা গেছে নতুন এক আলো।

হ্যাঁ, সমর ভালবেসেছে। ভালবেসেছে লীলা দত্তকে। তাদেরই পাড়ার এক প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবীর মেয়ে। বছর বাইশ বয়েস। শিক্ষিত, সুন্দরী, আধুনিক সমাজের মক্ষিরানী।

প্রথম দেখাটা দত্তবাড়িতেই। কল পেয়ে রোগী দেখতে গিয়েছিল সমর। রোগীর সম্বন্ধে যে-সব প্রশ্ন সে করেছিল, লীলাকেই তার জবাব দিতে হয়েছিল। অপূর্ব ভঙ্গি তার কথা বলার, ব্যবহার নিরহঙ্কার, মিষ্টিমধুর; তাই পেশার ডাক যেদিন শেষ হয়ে গেল, সেদিন নেশার হাতছানি সে উপেক্ষা করতে পারল না।

তরুণ সার্জেনকে লীলারও ভাল লেগেছিল। ভাল লেগেছিল তার সহজ সরল ব্যবহার, নির্ভীক মতামত, বলিষ্ঠ জীবন দর্শন। তাই অকুণ্ঠভাবে এগিয়ে এসেছিল। প্রথম প্রথম চায়ের নিমন্ত্রণ; তারপর বাড়িরই লনে টেনিস খেলায় যোগদানের অনুরোধ।

সমর সাগ্রহেই সাড়া দিয়েছিল। দত্তবাড়ির আসরে সে এখন প্রায় নিত্য অতিথি। তার চোখে নতুন আলো দেখে মায়া যেটা অনুমান করেছিল, সেটাই স্থির বিশ্বাসে পরিণত হল সমরকে সেদিন র‍্যাকেট হাতে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে। বিস্মিত হয়েছিল বৈকি মায়া; কিন্তু তার ধাক্কাটা এমনই আচমকা যে সে একটি কথাও বলতে পারেনি।

সমর বোধ করি সেটা লক্ষ্য করেছিল। হালকা সুরেই বলেছিল, ডাক্তারদেরও সময় সময় নিজের চিকিৎসার দরকার। দেহের না হলেও, মনের, কি বলেন?

মায়া নীরবে শুধু ঘাড় নেড়েছিল।

শুনুন, যদি কেউ আসে, বা আমাকে আপনার দরকার হয়, হয়তো হবে না, তবু একটা ফোন নম্বর লিখে নিন। আমায় রিং করে দেবেন।

লীলাদের বাড়ির ফোন নম্বর দিয়েছিল সে। আর খাতার পাতায় সেটা টুকে নিয়েছিল মায়া।

যেতে গিয়েও আবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল সমর। কৌতুকের সুরে প্রশ্ন করেছিল, আচ্ছা, নার্সের জীবন ছাড়া কি আপনার আলাদা জীবন নেই, মিস দে? নার্সের পোশাক ছাড়া আটপৌরে শাড়ির কথা বলছি।

বুকের ভেতর দুরদুর করে উঠেছিল মায়ার। এক ঝলক রক্ত দেখা দিয়েছিল দুই গালে।

নতুনতর কৌতুকে সমরের দুই চোখ নেচে উঠেছিল। জিজ্ঞেস করেছিল, আচ্ছা, কোনদিন কাউকে ভালবাসেননি?

ভীরু চোখ তুলে মায়া তাকাতে গিয়েও পারেনি। মুখ ফিরিয়ে কাঁপা গলায় জবাব দিয়েছিল, না ডাক্তার রায়।

তাহলে আর দেরি করবেন না। কাউকে হৃদয় দান করে ফেলুন। বুঝবেন কি অপূর্ব সে অভিজ্ঞতা! আচ্ছা, চলি আমি।

ভরা মনে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল সে, আর দুহাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল মায়া। সে জানে সমর কোথায় যাচ্ছে। টেলিফোনটা যে দত্তবাড়ির সেটাও তার অজানা নয়। আর দত্ত সাহেবের মেয়ে লীলা। তাকেও দেখেছে মায়া। দেখেছে সমরেরই চেম্বারে, দত্ত সাহেবের গাড়িতে বারদুয়েক। সত্যই সুন্দরী, সে শিক্ষিতাও নিশ্চয়।

উদ্গত নিশ্বাসটা গোপন করল মায়া।

2

টেনিসের শেষে লীলার সঙ্গে সমর এসে দূরের বেঞ্চটায় বসল বিশ্রামের জন্যে। পরিশ্রমে তখনও তাদের মুখে রক্তাভা, নিশ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত। চোখে অপরাহ্নের আলোয় দেখা যাচ্ছিল বিচিত্র এক মদিরতা।

সমর ভাবছিল আর চুপ করে থাকা সম্ভব নয়। লীলার কাছে সোজাসুজি বিয়ের প্রস্তাব করবে সে। কিন্তু সুযোগ মিলল না। তার আগেই একজন ভৃত্য এসে জানাল, আপনার টেলিফোন ডাক্তারবাবু। আমি ভদ্রমহিলাকে ধরে রাখতে বলেছি।

নিতান্ত অনিচ্ছাভরেই সমরকে উঠে দাঁড়াতে হয়। লীলা ভ্রূভঙ্গি করে বলল, তোমার নার্সটিই করছেন বোধহয়। তার মানেই তোমায় এখনি ছুটতে হবে। আমি ভেবেছিলুম কোথায় ব্রিজ নিয়ে বসা যাবে!

সে-লোভ সমরের নিজেরও বড় কম ছিল না; তবু যেতেই হয়। রিসিভারটা তুলে নিয়ে অপ্রসন্ন কণ্ঠেই ডাকল, হ্যালো!

ওপার থেকে ভেসে এল মায়ার সঙ্কুচিত কণ্ঠ, আমি মায়া বলছি। অজয়বাবু এসেছেন। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। কি একটা জরুরী কথা আছে। অবশ্য আপনার যদি কোন ক্ষতি না হয়—

যাচ্ছি। ওকে একটু অপেক্ষা করতে বলুন। রিসিভারটা যথাস্থানে নামিয়ে রেখে আবার যখন সমর লীলার কাছে ফিরে এল, মুখখানা তখন তার অপ্রসন্নতায় থমথম করছে। ক্ষুব্ধকণ্ঠে সে বলল, আমাকে ক্লিনিকে একবার যেতেই হবে। এক বন্ধু সেখানে

বাধা দিয়ে লীলা বলে উঠল, শুনে সত্যিই খারাপ লাগছে। আবার ফিরে আসবে তো? তোমায় ছেড়ে দিতে একেবারে ইচ্ছে করছে না।

সমরের বুকের ভেতর রক্তস্রোত উত্তাল হয়ে উঠল। কি উত্তর দেবে চট করে ভেবে পেল না।

লীলা সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল, কি, জবাব দিচ্ছ না কেন?

ততক্ষণে একটা পথ সমর আবিষ্কার করে ফেলেছে। সেটাই আন্তরিক কণ্ঠে ব্যক্ত করল, চেষ্টা করব—নিশ্চয়ই চেষ্টা করব। সঙ্গে যদি বন্ধুটি আসতে চান, অসুবিধে হবে কি?

ছি ছি। কি বলছ তুমি? নিশ্চয় নিয়ে আসবে।

অনেকখানি নিশ্চিন্ত হল সমর।

তার সঙ্গে যেতে যেতে লীলা প্রশ্ন করল, তোমার বন্ধুটিও কি ডাক্তার?

না। সেন এ্যান্ড সন বিজনেস ফার্মের নাম হয়তো শুনে থাকবে। অজয় হচ্ছে সেই সেন অ্যান্ড সনের সন।

খিলখিল করে হেসে উঠল লীলা। সমরের মনে হল বেলোয়ারি ঝাড়ে অকস্মাৎই ঝড়ের দোলা লাগল। বুকের ভেতরেও সেই ঝড়ের মাতন। সংক্ষেপে বিদায় নিয়ে সে দ্রুত পা চালাল।

চেম্বারে অজয় অপেক্ষা করছিল ঠিকই; কিন্তু সমরকে ফিরিয়ে আনার তাগিদ সে সত্যিই দেয়নি। সমর বেরিয়ে গেছে শুনে স্বাভাবিক কৌতূহলেই মায়াকে জিজ্ঞেস করেছিল, কোথায় গেল এমন অসময়ে? পেশাদার কলে?

ইতস্তত করে মায়া জবাব দিয়েছিল, আমি ঠিক জানি না, মিস্টার সেন—তবে—তবে মনে হয় না

তার ভঙ্গি দেখে অবাক হয়েছিল অজয়। বিস্ময়ের সুরে বলে উঠেছিল, তবে? আজকাল কি ও সামাজিক জীব হয়ে গেল নাকি?

কোথায় যেন পার্টিতে নিমন্ত্রণ ছিল—

খবরটা শুনেও অজয় যেন বিশ্বাস করতে পারেনি। কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে থেকে বলেছিল, আচ্ছা চলি। তাকে বলবেন, সুবিধে মত আবার একদিন আসবখন।

ফিরে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতেই মায়া ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠেছিল, না, না, যাবেন না, মিস্টার সেন। আমি জানি তিনি কোথায় গেছেন। এক্ষুনি তাঁকে ফোন করে দিচ্ছি।

বাধা দেবারও অবসরও পায়নি অজয়। এমন কোন জরুরী কাজ নেই এটুকু বলবার সুযোগও মায়া তাকে দেয়নি। ছুটে গিয়ে সমরের দিয়ে যাওয়া নম্বরটা ডায়াল করতে শুরু করে দিয়েছিল।

সমর এসে পৌঁছল। তার কর্তব্য পালন যেন শেষ হয়েছে, এমনই ভঙ্গিতে মায়া নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে গেল।

অজয় ক্ষমা ভিক্ষার সুরে বলল, বিশ্বাস কর ভাই, আমি ঠিক টেনে আনতে তোকে চাইনি। জানি তো, তোদের মত জহ্লাদের ভাগ্যে আমোদ আহ্লাদের শিকে কদাচিৎই ছেঁড়ে।

বিশেষজ্ঞর চোখ দিয়ে সমর তখন অজয়ের সর্বাঙ্গ যেন লেহন করছিল। বন্ধুকে ঠিক সুস্থ বলে মনে হল না তার। চিন্তিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে তোর বল তো। চেহারা এমন ভেঙে গেল কেন? লিভার?

অজয় হেসেই উড়িয়ে দিতে চাইল। বলল, না, না, লিভার আমার ক্যানাডিয়ান ইঞ্জিনের মতই চলছে। একটু ক্লান্ত লাগে, এই পর্যন্ত। হয়তো খাটাখাটুনিটা বেশি হচ্ছে বলেই

বাধা দিয়ে সমর জিজ্ঞেস করল, সত্যি বলছিস তো? ওমর খৈয়ামের মত দাও পেয়ালা পূর্ণ করে চালাচ্ছিস না?

না হে ডাক্তার, না। সে প্রবৃত্তিও নেই, সময়ও নেই। যে জোয়াল বাবা কাঁধে চাপিয়েছেন।

আচ্ছা, জামাটা খুলে ফেল তো। একবার পরীক্ষাটা করে নিই।

আপত্তির সুরে অজয় বললে, তোকে বলছি কিচ্ছু না। বরং একটা সর্বরোগহর জাতীয় টনিক দে, তাতেই

সমর প্রায় ধমকের সুরে বলে উঠল, কি করতে হবে, আমি জানি। তুই খোল জামা। অগত্যা অজয়কে সোফার ওপরেই শুয়ে পড়তে হল। সমর গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে পরীক্ষা করে চলল তাকে। ফাঁকে ফাঁকে অজয় বর্ণনা করে গেল তার দুঃখের কাহিনী, জানিস, বাবা নিজেকে হঠাৎই গুটিয়ে নিয়েছেন—সব কিছু ভার চাপিয়ে দিয়েছেন আমার কাঁধে। এখন ভদ্রলোক বারান্দায় বসে বসে চুরুট টানেন, আর আমি ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়ার মত যখন বাড়ি ফিরি, তখন তাকিয়ে তাকিয়ে মুচকি হাসেন। ভাবটা এই, বোঝ বাছাধন কত ধানে কত চাল।

হাতের কাজ বন্ধ না রেখে সমর জিজ্ঞেস করল, বাড়ি ফিরে কি করিস?

করি? করিটা কখন? ফিরতে ফিরতে তো কোনদিন রাত এগারোটা বারোটা, কোনদিন বা রাত কাবার।

বিস্ময়ভরে সমর একবার না তাকিয়ে পারল না।

হা হা করে হেসে উঠল অজয়। বলল, অবাক হচ্ছিস? ভাগ্য ভাল যে বিয়েটা করিনি। তাহলেই উদ্বাহ বন্ধনটা উদ্বন্ধনে দাঁড়াত রে! নিত্য বিরহের এই জ্বালা দুনিয়ার কোন সতী-সাধ্বীই বোধ হয় সইতেন না।

বন্ধুকে পাশ ফিরে শোবার ইঙ্গিত করে সমর নিরুত্তাপ গলাতেই প্রশ্ন করল, কিন্তু তুইই বা এত বাড়াবাড়ি করিস কেন?

অজয় অকস্মাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। সুর পালটে বলল, করি নিছক বাহাদুরি দেখাবার জন্যে নয়, সমর। বিরাট একটা কিছু গড়ে তোলার মধ্যে, চালানোর মধ্যে যেন একটা মোহ আছে। সুন্দরী মেয়ের তীব্র আকর্ষণও বলতে পারিস।

সমর ভ্রূকুঞ্চিত করল। পাশ ফিরে ছিল বলে অজয় সেটা লক্ষ্য করতে পারল না। নিজের খেয়ালেই বলে চলল, এই তো সবে মইয়ের প্রথম ধাপে পা দিয়েছি। অদুর ভবিষ্যতে মনে হয় একেবারে শেষ ধাপে উঠে যেতে পারব। ভদ্রলোককে তখন দেখাব মুচকি হাসতে আমিও পারি।

সমর পরীক্ষা শেষ করে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, শেষেরও তো শেষ থাকে শুনেছি।

হ্যাঁ, সেটা প্রস্থান; তবে মহাপ্রস্থান কিনা ঠিক বলতে পারব না।

হাত ধুতে সমর বাথরুমে গিয়ে ঢুকতেই অজয় উঠে বসে তার ছেড়ে রাখা জামাটা গায়ে গলিয়ে নিল। সমর তোয়ালে দিয়ে হাত মুছতে মুছতে বেরিয়ে আসতেই সে হালকা সুরে প্রশ্ন করল, শরীর-যন্ত্রের কোথাও কি বৈকল্য ঘটেছে বন্ধু?

সমর তার পেশাসুলভ গম্ভীর ভাবে জবাব দিল, এখনও নয়। তবে সারারাত ধরে কাজের মোহ তোকে ছাড়তে হবে। মানুষের স্নায়ুরও তো সহ্য করবার একটা সীমা আছে। মাথা থেকে বর্তমানে তোকে রাজমুকুটটি খুলে ফেলতে হবে। দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তাগুলো দূরে ঠেলে, খেলাধুলো আর খুশিমত ঘুরে বেড়ানো—এইতেই কিছুদিন মেতে থাকতে হবে।

বিষ হাসি হাসল অজয়। বলল, ডানা দুটো ছেঁটে দেওয়া হয়েছে রে, কাজেই ওসব আর পারব না। তুই বরং একটা টনিক-ফনিক কিছু দে।

তাই দোব। এক বোতল চলতি-হাওয়ার-পন্থী নরনারীর সাহচর্য। উচ্ছল প্রাণের ধারায় ছুটে চলেছে, এমন একদল তরুণ-তরুণী। আয়।

বন্ধুর মুখে এমন কাব্যিক কথাবার্তা শোনবার আশা অজয় কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি। কতক্ষণ বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে থেকে বলল, তুই কি কোথাও নিয়ে যেতে চাস?

সমর উত্তেজনায় উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলল, হাঁ, স্বাস্থ্যনিবাসে। উঠে পড়, আর দেরি করিসনি।

তার ভাবভঙ্গি দেখে অজয় বেশ খানিকটা কৌতূহলী হয়ে উঠল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেরিয়ে পড়ল বন্ধুর সঙ্গে।

লীলার সঙ্গে আলাপ সেই দিন থেকে।

প্রথম পরিচয়েই বিচিত্র এক প্রতিক্রিয়া দেখা দিল দুজনের মনেই। অজয়ের মনে হল জীবন-নদীতে অতি অকস্মাৎ একটা নতুন প্রাণশক্তির জোয়ার দেখা দিয়েছে। আর লীলার বুকের ভেতর রক্তস্রোতটা উত্তাল হয়ে উঠে শ্বাসরোধ করে আনল তার। কেমন যেন থিতিয়ে গেল সে।

গভীর রাতে দত্তবাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে সমর যখন নিজের চেম্বারে ফিরে এল, তখন তার মনে প্রচ্ছন্ন একটা অস্বস্তি। মাথার ভেতর এলোমেলো চিন্তা। নিত্যকার মত আন্তরিক আপ্যায়ন সে পায়নি। সে অবহেলিত, সে অনাদৃত।

সন্ধ্যার প্রতিশ্রুতি রাতের অন্ধকারে হারিয়ে গেছে।

.

পরদিন থেকে সমর কাজের চাপে নিশ্বাস নেবার ফুরসতটুকুও পেল না। নতুন নতুন রোগীর আনাগোনা তো ছিলই, সেই সঙ্গে ছিল শক্ত শক্ত গোটাকয়েক অস্ত্রোপচার।

হপ্তাখানেক পরে কাজের চাপ যখন একটু হালকা হল, তখন প্রথমেই তার মনে হল অজয় আর লীলার কথা। এতদিনের ভেতর কেউ তো আসেইনি, বা তার খবরটুকুও নেয়নি। টেলিফোনটা তুলে নিয়ে সে প্রথমেই অজয়কে ডাকল; কিন্তু শুনল সে বেরিয়ে গেছে।

এর পর সে লীলাকে ফোনে ডাকল। অনুরোধের সুরে বলল, হপ্তাখানক পরে আজ একটু ছুটি মিলেছে। কোথাও ঘুরে আসবে?

লীলা কিছুটা নিরুত্তাপ গলাতেই জবাব দিল, না, আজ বেরোতে পারব না।

মনঃক্ষুণ্ণ কিছুটা হলেও সমর সহজ কণ্ঠেই বলল, বেশ, তাহলে আমিই একটু পরে যাচ্ছি।

ঠিক সন্ধ্যার মুখেই সমর দত্তবাড়ি গিয়ে হাজির হল এবং প্রথমে যে লোকটির ওপর তার দৃষ্টি পড়ল সে হচ্ছে অজয়। বাড়িতে আর কোন অতিথি ছিল না; সুতরাং

ব্যথা পেল সমর। বুকের ভেতরটা মনে হল কে যেন সাঁড়াশি দিয়ে টানছে। তবু মুখের হাসি তাকে বজায় রাখতে হল। অজয়ের স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখে আনন্দ প্রকাশও করতে হল।

বন্ধুর সঙ্গে লীলার সম্বন্ধটা জানত না বলেই অজয় সত্যকার খুশিতে একেবারে উপচে উঠল। তার পিঠে গোটাকয়েক চাপড় কষিয়ে বলল, এর সব কৃতিত্বই তোর। বিনা ওষুধে এমন প্রেসক্রিপশন করতে আর কোন ডাক্তারই বোধহয় পারতেন না।

সমর ম্লানভাবে একটু হেসে একধারে বসে পড়ল। চোখ দুটো তার ঘুরে বেড়াতে লাগল লীলার চলাফেরার সঙ্গে। তার হাসি, কথা বলার ভঙ্গি ঘুঁটিয়ে ঘুঁটিয়ে দেখতে লাগল। বদলে গেছে, তার সম্বন্ধে লীলা অনেকখানি বদলে গেছে। যতবারই তার চোখে চোখ পড়ল, লীলা ফিরিয়ে নিল মুখখানা। দৃষ্টি তার অপরাধ কুণ্ঠিত। অথচ অজয়ের ওপর চোখ পড়তেই তার চোখে বিচিত্র এক আলো ঝলসে উঠছিল। মুখে নেমে আসছিল অপরূপ কমনীয়তা। বিমুগ্ধা কুরঙ্গিণীর ভঙ্গি তার কথা বলায়, হাসিতে।

বিক্ষুব্ধ মন নিয়েই সমর তাড়াতাড়ি ফিরে এল নিজের ক্লিনিকে। অকারণে রূঢ় হয়ে উঠল মায়ার ওপর। পরক্ষণে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে, একরকম জোর করেই তাকে হোস্টেলে পাঠিয়ে দিল।

অবশ্য প্রতিবাদ করেনি মায়া। শুধু নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে সারারাত চোখের জল ফেলল।

এর পরও বহুবারই সমর দত্তবাড়িতে গেল। নিমজ্জমান ব্যক্তি যেন বাঁচবার দুস্তর চেষ্টায় হাত-পা ছুঁড়ছে। তাতে জলেই ঢেউ উঠেছে, আবর্তের সৃষ্টি হয়েছে, বাঁচবার মত মাটি মেলেনি পা রাখার।

প্রতিবারই তার দেখা হয়েছে অজয়ের সঙ্গে।

.

সেদিন রাত এগারোটা বেজে যেতে সমর রোগীদের হাত থেকে বিশ্রামের অবসর পেল। ক্লান্ত শরীরটাকে এলিয়ে দিল আরামকেদারাটার ওপর। চুরুট একটা ধরাল বটে, কিন্তু টানতে পারল না। কি এক গভীর অস্বস্তি যেন রক্তকোষের ভেতরে ভেতরে সঞ্চারিত হয়ে চলেছে। রগের শিরাদুটো দপদপ করছে। চোখ দুটোয় আগুনের হলকা।

মায়া তার হোস্টেলে ফিরতে গিয়েও পারল না। থেকে থেকেই উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে উঁকি দেয়।

বিরক্ত হল সমর। পুরুষকণ্ঠে বলল, কাজ হয়ে গেলেই আপনাকে তো কত দিন বাড়ি চলে যেতে বলেছি, মিস দে।

মায়ার মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠল। কি একটা বলতে গিয়েও পারল না।

বোধ করি অকারণেই রূঢ় হয়ে উঠল সমর, আপনার এই বাড়াবাড়িতে আমার সুনামটা যে নষ্ট হতে পারে, সেটা ভাবেন না কেন?

মায়া চমকে উঠল। মনে হল কে যেন তার পিঠে কশাঘাত করেছে। চোখের জল চাপতে চাপতে ছুটেই সে ঘর থেকে পালিয়ে গেল।

একটু পরেই অজয় এসে হাজির হল। সেদিন লীলার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার পর আজই প্রথম এল।

সমর বেশ খানিকটা অবাকই হল। দেওয়াল ঘড়িটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, এই রাত দুপুরে? দত্তবাড়ি থেকে নাকি?

অজয় সংক্ষেপে জবাব দিল, হ্যাঁ। তারপরই নিজের জন্যে নির্দিষ্ট চেয়ারখানায় বসে পড়ল।

সমর চুরুটের বাক্সটা তার দিকে এগিয়ে দিল।

কতক্ষণ চুপ করে বসে রইল অজয়। কোন কিছুতেই যেন তার উৎসাহ নেই। এক সময় সোজাসুজি বন্ধুর দিকে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করল, লীলাকে তুই ভালবাসিস, সমর?

বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধতার ভেতর দিয়ে কাটল। তারপর একসময় নীরস কণ্ঠে সমর জবাব দিল, হ্যাঁ বাসি। তাতে আপত্তির কোন কারণ আছে?

অজয় একটা চুরুট বেছে নিয়ে ধরাচ্ছিল; অসহিষ্ণু গলায় বলে উঠল, আমরা দুই যুযুধান শত্রু নই, সমর। বন্ধুর মতই আলোচনা করতে চাই। কারণ আমিও তাকে ভালবেসেছি।

আমায় কি করতে বলিস? সরে দাঁড়াই?

না। তবে বন্ধু হিসেবে আমার কর্তব্য, কথাটা তোকে খুলে বলা।

ধন্যবাদ। কিন্তু তার কোন দরকার ছিল কি?

আবার কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। অজয় একসময় ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বলল, এমন একটা জিনিস যে আমাদের মধ্যে ঘটবে, কোনদিন কল্পনাও করিনি। তোর কিন্তু আগে থাকতেই আমাকে একটু আভাস দেওয়া উচিত ছিল, সমর।

সমর মুখ তুলে তাকাল। ঈষৎ বিদ্রূপের সুরে বলল, কেন? এ তো কারও ইজারা করা সম্পত্তি নয়। লীলাকে ভালবাসার অধিকার আর সবায়ের মত তোরও আছে।

মুখ সে একথা বললেও তার মন বলল, এটা বিশ্বাসঘাতকতা।

অজয় ক্লান্ত সুরে বলল, এখন ও নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই। তবে জেনে রাখ, বরমাল্য যার গলাতেই দুলুক আমার তাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই।

ক্ষতিবৃদ্ধি বলতে কিসের ইঙ্গিত করছিস?

আমাদের বন্ধুত্বের।

সমর তিক্ত হাসি হেসে উঠল। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, কথাটা অতিনাটকীয় হয়ে যাচ্ছে না?

না। অজয় আবেগ ভরা কণ্ঠে বলে উঠল, আমি চাই তুই-ই আগে লীলার কাছে বিয়ের প্রস্তাব কর। কারণ দাবিটা তোরই প্রথম।

সমরের দৃষ্টিতে ফুটে উঠল ইস্পাত কঠিনতা। শুষ্ককণ্ঠে সে বলল, তাতে লাভ হবে কিছু? বেশ, তুই যখন বলছিস, তখন আমিই যাব। গিয়ে প্রস্তাব করব তার কাছে।

ভগবান তোর মনস্কামনা পূর্ণ করুন।

অপরিচিত দুই ব্যক্তির মত সেদিন রাত্রে দুই বন্ধু পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিল।

পরদিন সত্যিই সমর দত্তবাড়ি গিয়ে হাজির হল। তার ভাগ্য ভাল, তাই লীলাকে একাই পেল। সমস্ত রকম ভূমিকা পরিহার করে সে সোজাসুজি প্রস্তাব করল লীলার কাছে।

লীলা প্রথমটা অবাক হল। তারপরই তার মুখে দেখা দিল ক্রোধের রক্তিমা। রূঢ়কণ্ঠেই সে বলল, তুমি আমাকে পেয়েছ কি? তোমার ক্লিনিকের নার্স, না বাড়ির দাসীবাদী?

সমর ভ্রুক্ষেপই করল না তার বিরূপ মন্তব্যে। বক্তব্যটা আবার বলল, বিয়ে করতে আমায় রাজী আছ, লীলা? তুমি তো জানো, আমি তোমায় ভালবাসি।

তুমি অভদ্র, বর্বর। তোমাকে কোনদিনই বিয়ে করতে পারব না আমি।

ওটা ছাড়া, অন্য কোন কারণ আছে?

লীলা বিদ্রূপের সুরে বলল, শুনলে যদি খুশি হও তাহলে বলতে আমার বাধা নেই। তোমার চেয়ে যোগ্য পাত্র আমি পেয়েছি। কথাটা বলে ফেলেই সে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। এতখানি রূঢ় না হলেও সে পারত।

সমর কিন্তু স্থিরদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, যোগ্যতর পাত্রটি কি অজয়?

হ্যাঁ। অস্ফুট কণ্ঠে লীলা জবাব দিল।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

সমরের মুখখানা কঠিন হয়ে উঠল। চোখে দেখা দিল শাণিত দৃষ্টি। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, সত্যভাষণের জন্য ধন্যবাদ। তবে অসভ্য বর্বর বলে পরিহাসটা না করলেই পারতে।

লম্বা লম্বা পা ফেলে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

অতএব অজয় আর লীলার বিবাহের দিন ধার্য হয়ে গেল। নির্দিষ্ট তারিখের আগের রাত্রে অজয় এল সমরের ক্লিনিকে। চেম্বারে পা দিয়েই সে রাগতকণ্ঠে বলে উঠল, তুই আমাকে ভুল বুঝছিস, সমর। তোর সামনে লীলা যা-ই বলে থাকুক, আসলে সে

বাধা দিল সমর, আমি কৈফিয়ৎ চাইনি, অজয়

তুই না চাইলেও, আমাকে তো

রক্ষে কর ভাই, আমার অনেক কাজ।

হতাশ হয়ে পড়ল অজয়। অভিমানহত কণ্ঠে বলল, ঠিক আছে। একদিন না একদিন সব বুঝবি তুই। আমাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি চিরকাল থাকতে পারে না।

তাই নাকি?

হ্যাঁ তাই। তাছাড়া শুধু এইটুকু বলতেই আমি তোর কাছে আসিনি।

সমর স্থিরদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আমাকে বিয়ে বাড়ি যেতে হবে—এই তো?

হাঁ, যাওয়া চাই-ই।

কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। চোখে তার এক বিচিত্র আলো ঝলসে উঠল। হেসে বলল, ঠিক আছে, যাব আমি। বিদায়টা জমবে ভাল।

3

বিবাহ চুকে যাবার পর অজয় আর লীলা মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে কলকাতার বাইরে চলে গেল।

এসব তথ্য কাগজের পাতা থেকে ঘুঁটিয়ে ঘুঁটিয়ে সংগ্রহ করল মায়া। লোভীর মতই মনে মনে রোমন্থন করত সেগুলো। বিজাতীয় এক আনন্দ পেত যেন।

সেদিনও এমনি এক সংবাদের ওপর বসে বসে চোখ বুলাচ্ছিল, এই সময় ডাক এল সমরের ঘর থেকে।

দুহাতে মুখ চেপে বসেছিল সমর। মায়া কাছে এসে দাঁড়াতেই ক্লান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, এখনও কজন রোগী ক্লিনিকে আছেন, মিস দে?

আর একজন।

তাঁকে কোনরকমে বিদায় করতে পারেন?

রীতিমত বিস্মিত হল মায়া। তবে সেটা যথাসাধ্য গোপন করে জবাব দিল, তা হয়তো পারি। বাড়ি যাবার জন্যে তিনি অধীর হয়ে পড়েছেন

খাসা। তাহলে তাঁকে জেলখানা থেকে খালাস করে দিন। তিনিও হাসতে হাসতে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যান।

কিন্তু কিন্তু আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না!

সমর নিস্পৃহ গলায় জবাব দিল, দিন কয়েকের জন্যে ক্লিনিক বন্ধ রেখে একটু বেড়িয়ে আসব ভাবছি।

মায়া চমকে উঠল। অব্যক্ত কণ্ঠে বলল, বেড়িয়ে আসবেন? কোথায়? কতদিনের জন্যে?

কে বলতে পারে? হয়তো বিশ তিরিশ বছরের জন্যে। অবশ্য ততদিন যদি বেঁচে থাকি।

মায়া শিথিল দেহে বসে পড়ল অনতিদূরে।

সেটা লক্ষ্য করে সমর ম্লানভাবে হাসল। বলল, আপনার সাময়িক একটু অসুবিধে হবে তা বুঝেছি। অবশ্য আমি তিন মাসের মাইনে আপনাকে দিয়ে যাব।

ঢোক গিলল মায়া। প্রায় অবরুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, কবে যেতে চান?

কবে কি? আজই—ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই।

মায়া আঁৎকে উঠল, ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই! কিন্তু কোথায় যাবেন?

সে-প্রশ্নটা নিয়ে এখনও মাথা ঘামাইনি। আর তাতে লাভটাই বা কি? পকেট থেকে খানদুয়েক দশ টাকার নোট বার করে সমর টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিল। বলল, এতে যদূর যাওয়া চলে।

মায়া বিস্ফারিত নয়নে শুধু তাকিয়ে রইল।

হঠাৎ যেন একটা কিছু মনে পড়েছে, এমনই ভঙ্গিতে সমর জিজ্ঞেস করল, আমাদের টাইম টেবল আছে না? দয়া করে যদি একবার এনে দেন।

মায়া নিঃশব্দে উঠে পাশের ঘরে চলে গেল এবং একটু পরেই ফিরে এল একখানা ব্র্যাডশ হাতে।

মায়া ভারী বইখানা তার সামনে ধরে দিতে যেতেই সমর তাকে ইঙ্গিত করল খুলে দেখতে। বলল, শুধু দেখবেন কুড়ি টাকার মধ্যেই যেন ভাড়াটা হয়। আর—আর কোন অখ্যাত অজ্ঞাত স্টেশন হলে তো কথাই নেই—সোনায় সোহাগা

মায়া পাতার পর পাতা উল্টে চলল। একসময় মুখ তুলে বলল, একটা পেয়েছি, মনে হচ্ছে-গিরমহল—ভাড়া উনিশ টাকা সত্তর পয়সা

খাসা। সমর রীতিমতো উৎসাহিত হয়ে উঠল, গিরমহল নামটা কখনো শুনিনি। আপনি শুনেছেন নাকি?

না।

রীতিমত রোমাঞ্চ হচ্ছে। অজ্ঞাতবাসের উপযুক্ত জায়গা।

সে উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়াল। পায়চারি করতে করতে কতকটা আত্মগতভাবেই বলে চলল, হয়তো সেখানে বড়জোর দশ-বিশটা কুঁড়ে ঘর...পোস্ট অফিস থাকতেও পারে, না-ও পারে...হপ্তায় একদিন হাট...মাইল দুতিন দূরে হলেই বা ক্ষতি কি?...খালি পায়ে শক্ত সমর্থ গ্রামের মেয়েরা শাকসজী মাথায় নিয়ে বেচতে আসে। তাদেরই একজনকে এনে বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করব...সন্তান সন্ততিতে ঘর ভরে উঠবে...তারা ভালবাসবে আমায়, শ্রদ্ধা করবে আমায়...তা যদি না করে ঠেঙিয়ে পাট করব সবাইকে

হঠাৎ মায়ার ওপর দৃষ্টিটা পড়তেই সে থেমে গেল। সঙ্কোচের হাসি হেসে বলল, আমার ভাবী জীবনের ছবি আঁকিনি, মিস দে; লেখক হবার উপক্রমণিকা। আমি একটু বেরোচ্ছি। বাড়িওলার সঙ্গে রাফসাফ করে আসি। বড়জোর ঘণ্টাখানেক লাগবে। আপনি ইত্যবসরে দুটো ব্যাগে আমার জিনিসপত্রগুলো ভরে রাখুন দয়া করে। শল্য-চিকিৎসার হাতিয়ারগুলো দিতে ভুলবেন না।

কথাশেষে ঝড়ের মতই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মায়ার মুখে কোন ভাবান্তর ঘটল না।

সত্যিই ঘণ্টাখানেক বাদে সমর ফিরে এল এবং ভেতরে পা দিয়েই একেবারে আঁৎকে উঠল। সারা মেঝে জুড়ে অসংখ্য ট্রাঙ্ক, হোল্ড-অল, ব্যাগ ইত্যাদি ছড়ানো; আর ভারী একটা সুটকেসের ওপর মায়া পা ছড়িয়ে বসে। মুখ তার তেমনি ভাবলেশহীন।

এসব কি?

মায়া উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, আমিও যাচ্ছি তো।

যাচ্ছেন? কোথায়?

গিরমহলে।

মুহূর্তের জন্যে সমর হতবাক হয়ে গেল। কথাটা সে বিশ্বাসই করতে পারছিল না। পরক্ষণে সে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, কি বলছেন পাগলের মত? যেখানে যাব, আপনাকে ছায়ার মতই সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে হবে নাকি?

একা থাকার বিভীষিকা বোধ করি মায়ার মন থেকে সব সঙ্কোচ শঙ্কা দূর করে দিয়েছিল। মৃদু অথচ সুদৃঢ় কণ্ঠেই সে বলল, আমি যাবই।

না। আমি একা যেতে চাই।

আপনি একাই থাকবেন। আমি কোন সময়ে কোন কারণে আপনার সামনে এসে বিরক্ত করব।

কেন বুঝছেন না? আমি কোথা থেকে আপনাকে মাইনে দেব?

মাইনে তো আমি চাইছি না।

দেরি হয়ে যাচ্ছে। একটু পরেই রওনা হতে হয়। সমর মরীয়া হয়ে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করল, কেন বুঝছেন না, মিস দে, আমি কোথায় থাকব, কি করব জানি না। অপরিচিত জায়গা-চোর-ডাকাত, বাঘ-ভাল্লুক থাকাও বিচিত্র নয়। তাছাড়া—তাছাড়া আমি যে যুধিষ্ঠির সেজেই থাকব

মায়ার চোখে ততক্ষণে জল ঘনিয়ে এসেছে। বাধা দিয়ে সে বলল, কেন মিথ্যে আমায় বারণ করছেন? আমি যাবই। আমি বোকা-সোকা মেয়ে, কার ভরসায় এখানে একলা থাকব। সবাই advantage নেবে।

চেষ্টা যে মিথ্যা সেটা মর্মে মর্মে বুঝল সমর। হতাশার ভঙ্গিতে বলল, ঠিক আছে। মেয়েরা জেদ ধরলে কে কবে তাদের নিরস্ত করতে পেরেছে?

মায়া খুশি হয়ে উঠল। চট করে চোখের জল মুছে বলল, আর আধঘণ্টা মাত্তর সময়। আমি ফোনে দুখানা ট্যাক্সি বলে দিয়েছি। খাওয়ার কোন হাঙ্গামা করে কাজ নেই। ট্রেনেই ডাইনিংকার আছে। আর ভোরের দিকে তো আমরা পৌঁছেই যাচ্ছি।

সুনিপুণ ব্যবস্থা! সমর হাসবে না কাঁদবে, ভেবে না পেয়ে ভারী ভারী ব্যাগ দুটো তুলে নিল। মনে মনে বলল তুমি বোকা-সোকা মেয়ে। হুঁ।

.

ভোরের দিকে ট্রেন গিরমহলে গিয়ে থামল।

পাহাড়ের সানুদেশে ছোট্ট স্টেশন। কুলির বালাই নেই। না বা আছে যাত্রীর। শুধু একজন শীর্ণকায় প্রৌঢ়কে পোস্টাল ভ্যান থেকে গোটা দুয়েক ব্যাগ নামাতে দেখা গেল। কে জানে, লোকটি হয়তো একাধারে পিয়ন এবং পোস্টমাস্টার দুই-ই।

বড় জোর মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে ট্রেনখানা আবার গন্তব্যস্থানের উদ্দেশে পাড়ি জমাল। শুন্য প্ল্যাটফর্মে মালপত্রের মাঝখানে বসে রইল সমর আর মায়া।

লোকালয় বলতে স্টেশনের কয়েকশ গজ পেছনে গোটাদুয়েক কুটিরকে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। সেখান থেকে আধমাইল-টাক দূরে ত্রিভুজাকৃতি একটা

পাহাড়ের চুড়োয় যে বড় বাড়িখানা রোদের মুকুট মাথায় পরে দাঁড়িয়ে আছে, প্রথম দর্শনে সেটাকে দুর্গ বলেই মনে হয়।

ব্যাগ হাতে পোস্টমাস্টারকে এদিকেই আসতে দেখে সমর উঠে দাঁড়াল। নমস্কার করে সে জিজ্ঞেস করল, এখানে কোন কুলি পাওয়া যাবে না?

কুলি! ভদ্রলোক হা-হা করে হেসে উঠলেন। চোখ মিটিমিট করতে করতে বললেন, কুলি বলতে আমিই।

আপনি কি এখানেই থাকেন?

হ্যাঁ, না থেকে আর যাব কোথায়? অধীনের নাম পাণ্ডে–রামস্বরূপ পাণ্ডে। পোস্টারমাস্টার অ্যান্ড মার্চেন্ট। ছোটখাট একটা বিশ্বকর্মা ভাণ্ডার আছে।

ভদ্রলোক একটু বেশি কথা বলেন। তা বলুন, সমরের তাতে সুবিধেই হল। সাগ্রহে সে জিজ্ঞেস করল, আমরা এখানে কিছুদিন থাকব ভাবছি। সুবিধেমত কোন বাড়ি-টাড়ি পাওয়া যাবে কি?

এমন একটা বিচিত্র প্রস্তাব নিয়ে কেউ কোনদিন আসেনি। চোখ দুটো যতটুকু সম্ভব বিস্ফারিত করে তিনি জবাব দিলেন, অজ্ঞাতবাসে এসেছেন? তা কতদিনের জন্যে?

সমর একটু নাটকীয় ভঙ্গিতে বলে উঠল, চিরকাল। যতদিন না মৃত্যু তার হিমশীতল বাহুবন্ধনে বেঁধে নিয়ে যায়।

কিছুক্ষণ নির্বোধের মতই পাণ্ডে তার মুখের তাকিয়ে রইলেন। বারকয়েক ঢোক গিললেন, তারপর মায়াকে চোখের ইশারায় দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, মহাশয়ের গৃহিণী?

মায়ার মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল; সমর কিন্তু স্নিগ্ধ হাসি হেসে বলল, না, আমার সেবিকা, মানে নার্স। আমি ডাক্তার।

পাণ্ডের চোখ দুটোয় একটা আলো চকচক করে উঠল।

আচ্ছা, আপনাদের এখানে কোন ডাক্তার আছেন?

জী হাঁ! সাতমাইল দূরের এক গাঁয়ে। কালব্যাধি ধরলে তাঁকে ডাকতেই হয়।

হাসি চেপে সমর বলে, কালব্যাধি যদি ধরে, তখন আর ডাকা-না-ডাকা তো সমানই।

মায়া ইত্যবসরে একটা স্যুটকেসের ওপর বসে পড়েছিল শিথিল দেহে। নেই, এ পোড়া দেশে আশা করার মত কিছুই নেই। তার অবস্থা দেখে সমর হেসে উঠল। পাণ্ডেকে বলল, দেখেছেন তো, সাধে আর বলে পথি নারী বিবর্জিতা! ওই বাড়িটার তাহলে কি হবে? পাওয়া যাবে?

পাণ্ডে মাথা চুলকোলেন, বহুক্ষণ ধরে কি যেন ভাবলেন, তারপর জবাব দিলেন, গিরমহলের কথা বলছেন? ওই পাহাড়ের চূড়ায় যেটা? আজ্ঞে এক বুড়ো সরকার ছাড়া আর তো কেউ ওখানে থাকে না।

ভাড়া পাওয়া যাবে না বোধ হয়?

জানি না স্যার। কোনদিন তো কাউকে এসে থাকতে দেখিনি! আর এসে কে-ই বা থাকবে বলুন? আশপাশে গাঁও নেই, তা ছাড়া বাড়িতে যাবার ওই পাথুরে পাকদণ্ডী পথ।

এবার সমর যেন সত্যিই খানিকটা হতাশ হয়ে পড়ল। এখানে এসেছে এক অন্ধ আবেগে, যুক্তি দিয়ে যার কোন ব্যাখ্যা করা চলে না। শেষ পর্যন্ত সত্যিই কি হার মেনে ফিরে যেতে হবে? একরকম মরীয়া হয়েই জিজ্ঞেস করল সে, আর কোন বাড়ি যেখানে আমরা গিয়ে কোন রকমে মাথা গুঁজতে পারি?

পাণ্ডেও চিন্তাকুল হয়ে উঠলেন। কতক্ষণ গুম হয়ে থেকে বিড়বিড় করে বললেন, কই, সেরকম তো কিছু—দাঁড়ান, দাঁড়ান—হপ্তা দুই আগে বুড়ো মিশির মারা গেছে—তার বাড়িটা হয়তো খালি হলেও হতে পারে।

চমকে উঠল মায়া। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে সন্দিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, কিসে মারা গেছেন ভদ্রলোক?

বয়েসের মৃত্যু মা! একশো তিন বছর সাত মাস যার উমার হল, তার কি কোন বেমারীর দরকার হয় মা?

সমর হেসে ফেলে বলল, সর্বনাশ! এই আজব দেশে লোকের গড়পড়তা পরমায়ু যদি একশো বছর হয়, তাহলেই তো আমায় ডেরা-ডেন্ডা তুলে পালাতে হবে। পরক্ষণে গম্ভীর হয়ে বলল, দয়া করে একটু খবর নেবেন, আপনার মিশির ঠাকুরের বাড়িটা পাওয়া যাবে কি না?

তা হয়তো যাবে স্যার। তবে এক বাত বলছি কি, আমার মত আপনাদের দুজনেরও দেখছি বহুত ভুখ লেগেছে। দয়া করে আমার গরীবখানায় চলুন। কিছু খানাপিনা করে নিন দুজনে।

অতি উত্তম প্রস্তাব! মিস দের কোন আপত্তি নেই তো?

মায়া উঠে দাঁড়াল। কোন কথা না বলে ইঙ্গিতে জানাল, তার কোন আপত্তি নেই।

খুশি হলেন পাণ্ডে। একগাল হেসে বললেন, আপনাদের সামান সব এখানেই পড়ে থাক। কিছু ভাবনা করবেন না। গিরমহলে চোর-ডাকু নেই। পরে ছোকরাদের পাঠিয়ে দেব নিয়ে যেতে।

অতঃপর সমর আর মায়া মৃত মিশিরের বাড়িতেই অধিষ্ঠিত হল। যেটা তারা আশঙ্কা করেছিল, বাড়িখানা তার চেয়ে কিন্তু অনেক ভাল। চারখানা মাঝারি আকারের ঘর, আলো-হাওয়া প্রচুর; চারদিকে কামিনী গাছের বেড়া দিয়ে ঘেরা।

মায়া ব্যবস্থার ভারটা নিজের হাতেই তুলে নিল। সামনে বড় ঘরখানা ডাক্তারের রোগী দেখার। দুপাশেই দুখানা ছোট ঘর—দুজনের শোবার। আর পেছনের খানা যৌথ খাবার এবং বসবার ঘর। সুবিধার মধ্যে দুপাশের শোবার ঘর থেকেই মাঝখানের দুখানা ঘরে যাতায়াত করা যায়।

সমর তাকিয়ে মায়ার গৃহকর্ম দেখছিল। একসময় গভীর স্বরে বলল, মিস দে, যদি কিছু মনে না করেন, একটা ব্যবসাদারী কথা বলি। বাড়ি ভাড়া, খাওয়া-দাওয়ার খরচ সব আমার। কিন্তু নিজের জীবিকা আপনাকে নিজেই অর্জন করতে হবে। সেটা রান্নাবান্না এবং পরিবেশন করে। রোজগারের বেলায় কোন প্রতিযোগিতা চলবে না কিন্তু। কোন প্রসব করানোর কেস এলে আপনি আপনার পারিশ্রমিক পাবেন, অন্য রোগের বেলায় কিন্তু ভিজিট যা কিছু—তা চালকলাই হোক, আর নগদ দক্ষিণাই হোক, আমার নিজস্ব। রাজী?

হাতের ঝাঁটাটা আবার তুলে নিয়ে রেখাহীন মুখে মায়া জবাব দিল, রাজী, ডাক্তার রায়।

.

কে জানত নাম লেখা বোর্ডখানা বাড়ির সামনে টাঙানো রীতিমত একটা অনুষ্ঠানে পরিণত হবে! গিরমহল থেকে তো বটেই, আশপাশের আরো পাঁচ-সাতখানা গ্রাম থেকে সমস্ত লোক ঝেটিয়ে এল দেখতে। পোস্টমাস্টার পাণ্ডে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর নিজস্ব ভাষায় এক দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন : ভাইলোগ! আর মরবার ভয় নেই। সবকোই এখন থেকে মিশির ঠাকুরের মত একশো বরষ জিন্দা থাকবে। কেঁউ কি কোলকাত্তা থেকে ভারি ডাংদার সাব আমাদের মধ্যে আসিয়ে গেলেন। যো কুছ বেমারী হবে, ডাংদার সাবকে দেখলেই ভাগবে

ঘন ঘন হাততালি পড়তেও ত্রুটি হল না।

দিন কেটে চলল। ডাক প্রায় নেই বললেই চলে। তবে ভাগ্যবলে জিনিসপত্রের দাম অবিশ্বাস্য রকমের সস্তা। শুন্য ঘরে বসে সমর মনে মনে হিসেব করে, এই হারে চললে, পুঁজি যা সঙ্গে এনেছে, তাতে পুরো বছর চলে যাবে। তার ওপর গাঁয়ের লোকের স্নেহের দান তো আছেই। সে-দান মহার্ঘ কিছু নয়, শাকসজী, কিছু ফল বা ডিম। প্রথম প্রথম সমর দাম দিতে চেয়েছিল, তাতে মনক্ষুণ্ণই হয়েছিল তারা। ডাক্তারবাবুদের তারা মনে করে এ-গাঁয়ের মান্য অতিথি। অতিথি সৎকারের কতটুকু কি-ই বা তারা করতে পেরেছে!

কৃতজ্ঞতায় সমরের মন ভরে ওঠে। ভরা মন আবার উপচে পড়তে চায় যখন সে বোঝে তার বেকারত্ব ঘুচোতে লোকগুলো মিথ্যে রোগের ছলনায় নিজেদের বা তাদের ছেলেমেয়েদের তার সামনে এনে হাজির করে। গিরমহল থেকে চার মাইল দূরে প্রতি

সোমবার যে হাট বসে, সেখানে তারা তাদের ডাংদার সাবের এমন উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রচারকার্য চালায়, যার দুচারটে কথা কানে এলেও লজ্জায় সমরকে ছুটে পালাতে হত।

মায়া কিন্তু এখানে এসে সত্যিকার সুখী হয়েছে। সমরের কাছে যেটুকু সঙ্কোচ তার ছিল, ধীরে ধীরে তা যেন কেটে যাচ্ছিল। এখন সে তার সামনে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে হাসে, সময় বিশেষে পরিহাস করতেও ছাড়ে না। নতুন বান্ধবী জুটিয়েছে সে পাণ্ডের স্ত্রীকে। প্রায়ই তার বাড়িতে যায়, গল্প-গুজব করে, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ছুটোছুটি করে বেড়ায়।

সমর কিছু দেখে, কিছু বা শোনে। মনে মনে মায়াকে ঈর্ষাও হয়তো করে। তবু সে তার মত সহজ স্বাভাবিক কোন রকমেই হয়ে উঠতে পারে না। অধিকাংশ সময় আত্মমগ্ন হয়েই থাকে সে। বেড়াতে বেরোয়ও একা। মাইলের পর মাইল পাহাড়ী পথে যখন হাঁটে, তার মুখে দেখে মনে হয়, বিষণ্ণতার শিকারী পাখিটা প্রশস্ত দুই ডানা মেলে তার অন্তরের আকাশ ঢেকে রেখেছে। মায়ার সঙ্গে কোথাও তার কোন বিরোধ নেই, তবু ঘনিষ্ঠও সে হতে পারেনি। অবশ্য সে চেষ্টাও করেনি। কেন, সে-জবাব হয়তো সে নিজেও দিতে পারত না। প্রথম দিকে অস্বস্তি ছিল, তাদের দুজনকে এক বাড়িতে থাকতে দেখে গাঁয়ের লোক হয়তো অনেক কিছু ভেবে নিতে পারে। কিন্তু না, সাদাসিধে লোকগুলো মিথ্যা কুৎসা রটানোর অনেক ঊর্ধ্বে। তবু

পেছন দিকের খাবার ঘর থেকে পাহাড়ের চুড়োয় গিরমহল বাড়িখানা বেশ পরিষ্কারই দেখা যায়। হাতে কাজ না থাকলে সমর অনেক সময় সেদিকে তাকিয়ে থাকে। রাতের অন্ধকারে বাড়িখানাকে মনে হয় যেন অতিকায় দৈত্য। অভ্রংলেহি তার লিপ্সা। চিৎ

কখনও সে অন্ধকার স্তুপে আলোক বিন্দু ফুটে ওঠে, ইতস্তত ঘুরে বেড়াতেও দেখা যায়। হয়তো বাড়ির তদারককারী সরকার আলো হাতে ঘোরাফেরা করে। কিন্তু সমরের বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না।

পাশে থাকলে মায়া আঁৎকে উঠে বলে, বাড়িটার দিকে চোখ পড়লেই আমার গা ছমছম করে। কত যুগের কত রহস্য যেন জমা আছে ওখানে। কে জানে, হয়তো বীভৎস ইতিহাসও একটা আছে!

সমরের নিজেরও সেটা মনে হয়। তবু মায়াকে আরো খানিকটা ভয় পাইয়ে দেবার জন্যে গড়গড় করে বলে যায় গিরমহলের এক কাল্পনিক ইতিহাস। বলে, একবার সে একা ওই বাড়িখানায় ওঠবার। চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পাকদণ্ডী পথ বেয়ে ওঠবার মুখে কে যেন বার বার তাকে নির্মমভাবে ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দিয়েছিল। দয়া করে প্রাণে যে মারেনি, এইটুকুই ভাগ্য।

দীর্ঘ ন মাস এইভাবে কেটে গেল। তাদের নিস্তরঙ্গ জীবনস্রোতে না দেখা দিল কোন অশান্তির আবর্ত, না বা প্রেমের উত্তাল তরঙ্গ। উত্তরমুখী ভাগীরথীর মত একটানা শুধু বয়ে গেছে।

4

অজয় আর লীলার বিবাহিত জীবনে কিন্তু ইতিমধ্যে ঘটে গেছে অনেক ভাঙাগড়া, বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে জীবনের স্রোত। প্রথম ছটা মাস তারা দুজনে পরস্পরের মধ্যে মগ্ন হয়ে ছিল। বাইরের জগতের দিকে তাকাবার অবসর ছিল না, প্রবৃত্তিও বুঝি ছিল না। তারপর একদিন তারা সচেতন হয়ে উঠল। মেনে নিল, না, বাইরের জগতের দিকে চিরদিন পেছন ফিরে থাকা চলে না। দাম্পত্য জীবনের প্রবল আসক্তি তখন স্তিমিত হয়ে এসেছে। প্রাখর্য কমেছে, স্থির হয়ে গেছে প্রদীপের মৃদু অকম্পিত শিখার মতই। নতুন করেই অজয় কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছে। তার জন্যে লীলা এতটুকু অসুবিধে বোধ করেনি। ঘর-সংসারের হাজারো কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছে, আস্বাদন করেছে স্বামী-প্রেমের মধুরতাটুকু। শুধু সমরের কথাটা মনে হলেই একটা বিঁধে থাকা কাঁটা বুকের কোথায় যেন খচখচ করে ওঠে। বিবেক তার কুণ্ঠিত ছিল বলেই পারতপক্ষে সে সমরের নাম উল্লেখ করত না। শুধু একটি দিনই কথায় কথায় অজয়কে বলেছিল, তোমার বন্ধু সমরবাবুটির বিচিত্র ব্যবহারের কথা আমি কোনদিনই ভুলতে পারব না। কেন যে সেদিন অমন অভদ্রের মত ব্যবহার করেছিলেন।

অজয় একটুখানি চুপ করে থেকে মৃদু কণ্ঠে বলেছিল, হয়তো বেচারা বড় বেশি ভালবেসেছিল তোমায়, তাই সহজ মনে পরাজয়টা সে মেনে নিতে পারেনি।

প্রতিবাদের সুরে লীলা বলে উঠল, না, আমার তা মনে হয় না। নিশ্চয়ই অন্য কোন কারণ আছে।

আর কি কারণই বা থাকতে পারে?

তা আমি জানি না। তবে

তবে ওর সম্বন্ধে আর কোন আলোচনা আমাদের না করাই ভাল, লীলা। তার কণ্ঠস্বরে এমন একটা কিছু ছিল, যার পর লীলা সত্যিই স্বামীর সামনে সমরের নাম আর কোনদিন উল্লেখ করেনি।

পরিশ্রমটা বড় বেশি করছিল বলেই ভেতরে অজয়ের স্বাস্থ্যটা ভেঙে পড়েছিল। প্রথম দিকে লীলা সেটা লক্ষ্য করেনি। করল যেদিন, সেদিনই শঙ্কিত কণ্ঠে বলল, এরকম ভাবে অবহেলা করাটা তো ঠিক নয়। একজন ডাক্তার দেখাও।

অকারণে অজয় যেন আহত জন্তুর মতই গর্জন করে উঠল, ডাক্তার! শহরে কোন ডাক্তার নেই। ছিল একজনই—সে চলে গেছে। কোথায় তা ভগবানই জানেন।

লীলা আর কোন প্রতিবাদ করেনি। তাই বলে নিরস্ত্রও হতে পারেনি। মরীয়া হয়েই শেষ পর্যন্ত সে শ্বশুরের শরণাপন্ন হল।

ব্যবসাটা পুরোপুরি ছেলের হাতে ছেড়ে দিয়ে বৃদ্ধ মিঃ সেন অবসর নিয়েছিলেন। জীবনে তাঁর শুধু একটিই আনন্দ ছিল। কাগজের পাতায় দূর গ্রামাঞ্চলে বাড়ি বিক্রির বিজ্ঞাপন

হাতড়ে বেড়ানো। সেদিনও বসে তাই করছিলেন। পাশেই চায়ের খালি পেয়ালা, সামনে টেবিলের ওপর দৈনিক আর মাসিক-পত্রের স্তূপ। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট।

লীলা ঘরে ঢুকে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। একটু ইতস্তত করে মৃদু কণ্ঠে বললে, বাবা, আপনার ছেলের শরীর নিয়ে তো রীতিমত ভাবনার কথা হয়ে দাঁড়াল।

মুখ তুললেন মিঃ সেন। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, কেন, কি হয়েছে মা?

লীলা তাঁর কাছে কিছুই গোপন করল না। ডাক্তার দেখানোয় অজয়ের আপত্তির কথাও জানাল।

মিঃ সেন সবটুকু শুনে গেলেন। পরে শান্ত কণ্ঠেই বললেন, কিচ্ছু ভাবনা কর না, লিলি! আমাকে শুধু একটু সময় দাও।

তা নয় দিচ্ছি। কিন্তু যা করবার, তাড়াতাড়ি করতে হবে বাবা। দেরি করলে হয়তো হাতের বাইরে চলে যাবে।

ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছিল সে, মিঃ সেন তাকে ফিরে ডাকলেন, শোন, শোন লিলি, এই ছবিখানা দেখ দিকিনি—

হাতের কাগজখানা তিনি পুত্রবধূর সামনে মেলে ধরলেন। পাহাড়ের চুড়োয় অবস্থিত একটা বাড়ির ফোটো। তলায় শীঘ্রই বিক্রয় হইবে।

শ্বশুরের কাঁধের ওপর ঝুঁকে পড়ে লীলা ছবিখানা দেখে বলে উঠল, বাঃ! চমৎকার তো। ঠিক যেন স্বপনপুরীর রাজপ্রাসাদ।

কাগজখানা মুড়ে ফেলে মিঃ সেন গম্ভীর মুখে বললেন, ঠিক বলেছ মা, আমারও সেই মত।

দিন সাতেক পরে রাত্রে খাওয়ার টেবিলে বসে মিঃ সেন ছেলেকে বললেন, তোমার ব্যবসা চালাবার রীতিনীতি আমার পছন্দ হচ্ছে না বাবু!

অজয় বিস্মিত দৃষ্টি মেলে বাপের দিকে তাকিয়ে থাকে।

তুমি সব গোলমাল পাকিয়ে ফেলছ! ব্যবসা হবে ঋজু—সরল। বক্সিং তো কিছুদিন লড়েছ, নক-আউটটা বোঝ না?

অজয় গম্ভীর হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, কি বলতে চাইছেন বাবা?

কিছু না। কিছুদিন আমি আবার ব্যবসাপত্তর দেখব। যে জট পাকিয়েছ, সেটাকে আবার সোজা পথে চালাব।

যা খুশি আপনার! বলে অজয় টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

মিঃ সেন এবার পুত্রকে ছেড়ে পুত্রবধূকে ধরলেন, তোমার স্বাস্থ্যটাও তো খুব ভাল যাচ্ছে না, লিলি?

শ্বশুরের চাতুরীটা সে বুঝতে পেরেছিল বলেই সেও মিথ্যার আশ্রয় নিল।

অভিনয়ের ভঙ্গিতে বলল, কি জানি বাবা, মাঝে মাঝে এমন কুঁড়েমি লাগে! কিছুদিন ধরে রাত্রে ভাল ঘুম হচ্ছে না।

যেতে গিয়েও অজয় দরজায় গোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়েছিল। মনে মনে সে লজ্জিত হয়ে উঠেছিল। লীলার শরীর ভাল যাচ্ছে না, এটা সে আগে ধরতে পারেনি বলে অভিযোগের সুরে সে স্ত্রীকে বলল, তুমি তো কই কোনদিন বলনি, লীলা?

লীলা হাসি চেপে বলল, ও এমন কিছু না। এমনি মাঝে মাঝে

মিঃ সেন তাড়াতাড়ি কণ্ঠে জোর দিয়ে বলে উঠলেন, না, না, এসব উড়িয়ে দেওয়া ঠিক নয়। হ্যাঁ, তোমাকে যে বাড়ির ফটোখানা দেখিয়েছিলাম, মনে আছে, লিলি? সেই যে পাহাড়ের চুড়োর ওপর?

হ্যাঁ, বাবা।

সেটা কিনে ফেলেছি মা। জায়গাটা খুব স্বাস্থ্যকর, আর বেশ নির্জন। আমার ইচ্ছে, তোমরা সেখানেই কিছুদিন থেকে আসো। তদারকি করবার জন্য একজন সরকার রেখেছি। কোনরকম অসুবিধে হবে না।

লীলা নিরীহের ভঙ্গিতে বলে উঠল, আমার তো যাবার খুবই ইচ্ছে বাবা, কিন্তু– সে ফিরে তাকাল স্বামীর দিকে।

অজয় ভারী গলায় বলল, ঠিক আছে।

তাই হবে বাবা। আমরা কিছুদিনের জন্যে বেড়িয়ে আসব।

মিঃ সেন হাসি চেপে পুত্রবধুর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকালেন শুধু।

.

পাকদণ্ডী পথ বেয়ে গিরমহলে পৌঁছতে হলে নিশ্বাস ঘন হয়, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন যায় বেড়ে। তবু চড়াই ভাঙতে ভাঙতে লীলা একেবারে আনন্দে উপচে পড়ল। তারই ছোঁয়া বুঝি লাগল অজয়কেও। সেও রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠল।

দুজনেই এসেছে তারা। সঙ্গে কোন ঝি-চাকর আনেনি। সরকার ভজহরি ঠিক করে রেখেছে। রোজ সকালে দেহাত থেকে একজন মেয়ে এসে তাদের বাসন মেজে রান্নাবান্না করে দিয়ে যাবে। এখানকার জীবনে বোধ করি তার বেশি কিছু প্রয়োজনও হবে না।

অনেকখানি উঁচুতে উঠে এসে লীলা ফেলে-আসা গ্রামখানার দিকে একবার ফিরে তাকাল। এখান থেকে সেটাকে কুশলী শিল্পীর হাতে-আঁকা একখানা নিখুঁত ছবি বলেই মনে হচ্ছে।

আনন্দে খিলখিল করে হেসে উঠল লীলা। অজয় বললে, এত যখন ভাল লাগছে তোমার, তখন বেশ তো, মাঝে মাঝে গ্রামে যাওয়া যাবে। কিছু বন্ধু বান্ধবও জোগাড় হবে।

লীলা কিন্তু ততক্ষণে একখানা পাথরের ওপর বসে পড়েছে। অজয় গিয়ে তার পাশে বসতে বসতে বলল, কি হল লীলু, ক্লান্ত নাকি?

না গো, উপভোগ করছি।

তার চেয়ে কাঁধে যখন একবার করেছি তখন এইটুকুও না হয় বয়ে নিয়ে যেতে দাও।

সত্যিই সে দুহাত দিয়ে শুন্যে তুলে নিল লীলাকে, বুকের ওপর কিছুটা বা চেপেই ধরল।

খুশিতে খিলখিল করে হেসে উঠল লীলা। বাঁ হাত বাড়িয়ে স্বামীর গলাখানা চেপে ধরে কৃত্রিম কণ্ঠে বলল, এই, কি হচ্ছে দুষ্টু! শিগগির নামিয়ে দাও, কেউ হয়তো দেখে ফেলবে।

এই মিষ্টি হুকুমটুকু শোনবার কোন আগ্রহ দেখা গেল না অজয়ের। বাকি পথটুক সে লীলাকে বয়েই নিয়ে চলল।

বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিল ভজহরি আর সেই দেহাতী মেয়েটি তাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে।

শীর্ণ দীর্ঘ দেহ ভজহরি। বয়সের ভারে একটু বা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। মাথার চুলে তুষারমৌলি হিমালয়ের শুভ্রতা। নতুন মনিব আর তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে করে সে ভিতরে নিয়ে চলল।

সাবেকী আমলের বাড়ি। অসংখ্য বড় বড় ঘর, চওড়া চওড়া বারান্দা। ছাদটা একেবারে পাহাড়ের কিনারায় গিয়ে ঠেকেছে।

শ্রান্তি ক্লান্তি যেন ভুলে গেল লীলা। তখুনি কোমরে কাপড় জড়িয়ে ফেলল। তারপর অজয়কে নিয়ে ঘুরে ঘুরে ব্যবস্থাপত্র করতে লাগল। সকালে কোথায় বসবে, কোথায় খাবে, ঘুমোবেই বা কোন্ ঘরে।

.

সে রাত্রে খাবার ঘরে বসে মায়া আর সমর দুজনেরই নজরে পড়ল গিরমহলে প্রাণের সাড়া জেগেছে। ঘরে ঘরে আলো সঞ্চারিত ছায়ামূর্তি।

আগন্তুকের খবরটা পাণ্ডের স্ত্রীর কাছ থেকে মায়া আগেই পেয়েছিল। তাই ভেতর ভেতর তার উত্তেজনা আর কৌতূহলের অন্ত ছিল না। এক সময় সেটা আর চাপতে না পেরে বলে উঠল, জানেন ডাক্তার রায়, গাঁয়ে যে হৈচৈ পড়ে গেছে!

সমর কোন কথা না বলে প্রসন্ন দৃষ্টিটা শুধু তুলে ধরল। মায়া বলে চলল, পাহাড়ের মাথায় বাড়িটায় লোক এসে গেছে।

কোন বিস্ময় প্রকাশ করল না সমর। নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল, দেখছি তো!

খোলা জানালার ভেতর দিয়ে মায়া আর একবার গিরমহলের দিকে তাকাল। চাঁদের আলোয় বাড়িখানা সত্যিই সুন্দর দেখাচ্ছে। রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে যেন। স্বতঃই মায়ার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে, তাই না?

হ্যাঁ, এই কালো জগতে সব সৎকাজই ঝকঝক্ করে। পরক্ষণেই মায়ার দিকে ফিরে শ্লেষের সুরে সমর বলল, সত্যি কিন্তু তা করে না, মিস দে।

কথাটা গায়ে মাখল না মায়া। নিজের খেয়ালেই বলে চলল, পাণ্ডের স্ত্রী বলছিলেন, অল্পবয়সী স্বামী স্ত্রী—হয়তো মধুচন্দ্র যাপন করতে এসেছেন। দেখতেও খুব সুন্দর। সর্বাঙ্গে নাকি শহরের ছাপ।

সমর মন্তব্য করল, যেমন গোড়ার দিকে আমাদের ছিল।

মায়া আবার কথাটা এড়িয়ে গেল। বলল, কি জানি, গাঁয়ের দিকে ওঁরা নামবেন কিনা। আলাপ করা যেত। নতুন মুখ যে কতদিন দেখিনি।

গম্ভীর দৃষ্টিতে সমর কতক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, আমার মনে হচ্ছে, এখানে আপনার মন টিকছে না। যদি সত্যিই তাই হয়

কড়া সুরে প্রতিবাদ করল মায়া, না, কক্ষনো না। খুব মন টিকছে আমার।

না টেকাটা অস্বাভাবিক নয়, মিস দে। শহরে মানুষ হয়েছেন আপনি; কাজেই শহরের আলো, শহরের রাস্তা, শহরের ফ্যাশনের জন্য মনটা কেঁদে উঠতে পারে বৈকি।

না, পারে না।

আপনি বলতে চান, এখানে সত্যিই আপনার ভাল লাগছে?

হ্যাঁ, লাগছে।

চিরকাল থাকতে পারেন?

পারি।

খাওয়া শেষ করে সমর চেয়ারে হেলান দিয়ে পড়ল। উত্তাপহীন কণ্ঠে বলল, না, সত্যিই আপনার প্রশংসা করতে হয়। কে জানে, আমাকেই হয়ত এখান থেকে একদিন চলে যেতে হবে।

মায়ার চোখে শঙ্কার ছায়া ফুটে উঠল। প্রায় আর্তনাদের সুরে সে বলল, আপনি—চলে যাবেন এখান থেকে?

মন যদি চায়, যেতে হবে বৈকি! আমার কাছে তো সব জায়গাই সমান। তবু ভারি খুশি হলুম আপনি এখানে থাকতে চান শুনে।

মায়া চকিতে উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। আবেগ কম্পিত কণ্ঠে বলল, কিসের টোপ গেলাতে চাইছেন আমায়?—আপনি জানেন আমি ভালবাসি

আচমকা থেমে পড়ে নিজেকে সামলে নিল সে।-আমি ভালবাসি এই গাঁকে, গাঁয়ের লোকদের কিন্তু এত নিষ্ঠুর আপনি কেন? আপনার কি ক্ষতি আমি করেছি? কান্না চাপতে চাপতে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

.

রাতের খাওয়া শেষ করে অজয় আর লীলা তখন বাইরের বারান্দায় বসে ছিল। অদূরে দাঁড়িয়ে সরকার ভজহরি বলছিল, আজকে এই বাড়িটার নাম গিরমহল হয়েছে বটে, কিন্তু বাবু, গোড়াতে এর নাম ছিল নিরাময়।

নিরাময়? অব্যক্ত কণ্ঠে লীলা বলে উঠল, অদ্ভুত নাম তো! আসলে এটা কি কোন হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য-নিবাস ছিল?

না, মা। বাড়িটার একটা ইতিহাস আছে। প্রথম যিনি এই প্রাসাদ তৈরি করেন, তাঁর সময় থেকেই এই নামটা চলে আসছে। দুশো বছরের মধ্যে গিরমহল হাতবদল হয়েছে অনেকবার, কিন্তু সে ইতিহাসটা আজো মরে যায়নি।

অজয় কৌতূহলের সুরে প্রশ্ন করল, ইতিহাসটা জানেন আপনি?

আজ্ঞে, এখানকার লোক যখন, তখন জানি না বলি কি করে!

লীলা মিনতির সুরে বলল, আমাদের বলুন না, সরকার মশাই!

এমন আগ্রহী শ্রোতা ভজহরি বোধ হয় বহুদিন পায়নি। তাই সে পরম উৎসাহে বলতে শুরু করল, বাড়িটা যিনি প্রথম তৈরি করান, তিনি এই তল্লাটে রাজাই ছিলেন বলতে পারেন। তাঁর স্ত্রী রানীসাহেবা খুব সুন্দর দেখতে ছিলেন। এখানে যখন ওঁরা বাস করতে আসেন তখন সঙ্গে করে রাজাসাহেব তাঁর এক বন্ধুকে নিয়ে এসেছিলেন। খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁকে ছেড়ে একটা দিনও রাজাসাহেব থাকতে পারতেন না। কিন্তু সেই বন্ধু একদিন রানীসাহেবাকে নিয়ে পালিয়ে গেলেন। রাজাসাহেব কিছু বললেন না, কোন হৈচৈও করলেন না। শুধু একলা ঘরে বসে বসে দিনের পর দিন একটা তলোয়ারে শান দিতে লাগলেন। কিসের জন্যে? তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বাবু, যে, ওঁরা দুজন বন্ধু আর রানীসাহেবা ফিরে একদিন আসবেনই।

লম্বা পনেরো বছর পরে বন্ধুটি একলা ফিরে এলেন। রাজাসাহেবকে বললেন, একাই আমাকে আসতে হল বন্ধু, কারণ তোমার স্ত্রী মারা গেছে। অপরাধী আমি, আমায় শাস্তি দাও। যদি হত্যা করতে চাও, তাই কর। রাজাসাহেব কিন্তু বন্ধুকে হত্যা করেননি, বরং ভালবেসে বুকেই টেনে নিয়েছিলেন। রানীর কথা রাজার মনে রইল না। তারপর থেকে বরাবর একসঙ্গে ছিলেন ওই বাড়িতে। মারা যাবার আগে তিনিই বাবু বাড়িখানার নামকরণ করেন নিরাময়।

ভজহরি তার ইতিহাস শেষ করল। অজয় কিন্তু তার স্ত্রীর মুখের দিকে আর তাকাতে পারল না। কতক্ষণ অস্থির চরণে পায়চারি করে একসময় সরকারের সামনে দাঁড়িয়ে

পড়ে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল, আপনার ইতিহাসের সঙ্গে বাড়ির নিরাময়নামের কোন সম্বন্ধ আছে কিনা বলতে পারেন?

আজ্ঞে না বাবু, তা পারব না। তবে গল্প যেটা চলে আসছে, সেইটাই আপনাদের বললাম।

অকস্মাৎ লীলার হাত ধরে টেনে তুলতে তুলতে অজয় বলল, চল শুয়ে পড়িগে। বড় ঘুম পাচ্ছে।

5

সেরাত্রে কিন্তু মায়াও ঘুমোতে পারছিল না। বালিশে মুখ গুঁজে কোনরকমে কান্না রোধ করছিল।

রাত গভীর। কে জানে হয়তো একটা কি দেড়টা। হঠাৎ দরজায় টুকটুক করে শব্দ হতেই সে চমকে উঠল। কতক্ষণ পড়ে রইল কাঁপুনি-ধরা বুকে। তারপর একসময় চাদরখানা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দিল।

সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল সমর। বাঁ-হাতে একটা জ্বলন্ত মোমবাতি। ডান হাতের তর্জনীটা প্রসারিত করে রেখেছে। কেটে গিয়ে রক্ত ঝরছে ডগা থেকে। প্রথমটা সমর মায়ার দিক থেকে দৃষ্টি ফেরাতে পারল না। এমন ভাবে রাতের পোশাকে কোন নারীকে সে বোধ করি দেখেনি। খোলা চুল, শিথিল বসন। পিছনের স্বল্পালোকিত ঘরখানা যেন এক স্বর্গরাজ্যের ইঙ্গিত। মুহূর্তের জন্য বুঝি স্বপ্ন দেখল সমর। এই স্বর্গরাজ্যে নীড় বাঁধা চলে—যে নীড় ভালবাসার উষ্ণতায় ঘেরা। যেখানে দেহ আর আত্মা পরিপূর্ণভাবে সমকামী হতে পারে।

কিন্তু পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে সে সহজ কণ্ঠেই বলল, কিছু মনে করবেন না, মিস দে। রাত দুপুরে আপনাকে বিরক্ত করলুম। আঙুলটা অনেকখানি কেটে গেছে। আইডিন দিয়ে যদি একটু বেঁধে দেন, ভাল হয়। কারণ নিজে কিছুতেই পারলুম না।

প্রাথমিক চিকিৎসার যা কিছু সরঞ্জাম বাইরের ঘরে থাকে। সেখানে এসে মায়া আঙুলের এই ক্ষতটা পরীক্ষা করল। তারপর তুলে দিয়ে রক্ত মুছতে মুছতে ভরা গলায় জিজ্ঞেস করল, কি করে কাটল?

দৃষ্টিটা তার মুখের ওপর থেকে সমর দূরেই সরিয়ে রেখেছিল। সেই অবস্থাতেই ছাড়া ছাড়া ভাবে জবাব দিল, কি জানি হয়তো ফ্রয়েড সাহেব বলতে পারেন। ত্যাগ, প্রায়শ্চিত্ত বা অন্য কিছু—অন্যমনস্কভাবে আমি অস্ত্রোপচারের ছুরি নিয়ে নাড়াচাড় করছিলম-উঃ! আস্তে, আস্তে, মিস দে। অতখানি নিষ্ঠুর না-ই বা হলেন—রাতে খেতে বসে আপনার সঙ্গে আমি ব্যবহারটা ভাল করিনি। আপনি তার শোধ তুলবেন না। সত্যি গিরমহল ছেড়ে যাবার কথা কোনদিন ভাবিনি আমি। আর যদি ভেবেই থাকি, আপনি তো জানেন, আপনাকে এখানে এভাবে ফেলে রেখে যেতে পারি না। আজ আমার কাছে আপনি মৌতাতের মত হয়ে উঠেছেন—আফিমই বলতে পারেন

মায়ার গালদুটো রক্তাভ হয়ে উঠল। আঙুলে ব্যান্ডেজ বাঁধতে গিয়ে হাতটা বোধ করি একটু কেঁপেই উঠল। আরো খানিকটা সে ঝুঁকে পড়ল ধরে-থাকা সমরের হাতখানার ওপর।

.

গিরমহলের নিস্তরঙ্গ জীবন স্রোতে হঠাৎই একদিন ঘূর্ণি দেখা দিল।

অপরাহ্ন। সূর্য পাটে বসেছে। বাড়ির পশ্চিম দিকের ছাদে অজয় আর লীলা হাত ধরাধরি করে পায়চারি করছিল। জীবনপ্রাচুর্যে ভরা দুটি শিশু যেন।

ছাদের একটু নিচুতে পাহাড়ের দিকে খোলা ঝুল বারান্দা একটা ছিল। ফুট তিরিশেক নীচে পাহাড়েরই একটা অংশ যেন গা এলিয়ে রয়েছে। ছড়ানো গা-টা নেমে গেছে অনেক নীচে সমতল জমির ওপর। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, ঝুলবারান্দাটা অনেক উঁচু থেকে উদ্ধত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে নগণ্য গ্রামখানার দিকে।

বেড়াতে বেড়াতে অজয় আর লীলা ঝুল বারান্দাটার কিনারে এসে পৌঁছল। দেখল দুটো চড়ুই পাখি আলসের ওপর বসে অস্তগামী সূর্যের ম্লান আলোয় ডানা মেলে দিয়েছে।

বড় কাছাকাছি বসে ছিল তারা। জীবন সম্বন্ধে যেন নিস্পৃহ। তবু মানুষের আবির্ভাব তারা সহ্য করতে পারল না। কিচমিচ করে বোধ করি প্রতিবাদ জানিয়ে উড়ে পালাল।

অজয়ের হাতে মৃদু চাপ দিয়ে লীলা বলল, দেখলে?

অজয় জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল। বিশেষ করে দেখবার মত কিছুই তার নজরে পড়েনি।

লীলা বলল, দুটো পাখিই পুরুষ।

কথাটা সত্যি। কারণ দুটো পাখিরই পালকে গাঢ় কালো এবং বাদামী রংয়ের খেলা—যেটা পুরুষ পাখিরই নিশ্চিত অভিজ্ঞান।

অজয়ের বুকের মধ্যে বিচিত্র এক অনুভূতি দেখা দিল। তার মনে পড়ে গেল গিরমহলের ইতিহাসের কথাটা।

সূর্য পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হল।

সারা দৃশ্যপটেরই রূপান্তর ঘটল।

অদ্ভুত মনে হচ্ছিল ঝুল বারান্দাটাকে। ওরা লোভ সামলাতে পারল না। ঘুরে সিঁড়ি বেয়ে ঝুলবারান্দায় নেমে এল। লীলা মুগ্ধ দৃষ্টিতে নীচের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে উঠল, দেখছ, নীচের দিকে তাকিয়ে দেখছ! গ্রামখানাকে এত কাছে মনে হচ্ছে, যেন এখান থেকে ঢিল ছুঁড়ে মারা যায়। অজয় সস্মিত মুখে বলল, এত যখন ইচ্ছে, তখন গাঁয়ের দিকে একবার বেড়িয়ে আসতে পারো। বাড়ি থেকে কতটুকুই বা পথ! হয়তো প্রথমেই দেখা হয়ে যাবে গাঁয়ের ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে।

হেসে উঠল সে। একটু বা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। পা বেধে গেল আলসেয়; টাল সামলাতে পারল না। লীলা আর্তধ্বনি করে ছুটে আসবার আগেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল নীচে-—অনেক নীচে।

লীলার আর্তধ্বনি আর একবার সারা বাড়িখানাকে উচ্চকিত করে তুলল। ছুটে গিয়ে সে আলসের কিনারায় ঝুঁকে পড়ল। দেখল, ফুট তিরিশেক নীচে অজয়ের নিস্পন্দ দেহটা পড়ে আছে।

কি ভাবে কোথায় দিয়ে সে নীচে নেমে এল, নিজেই জানে না। স্বামীকে পরীক্ষা করে দেখল, তার প্রাণকুটুই আছে, কিন্তু জ্ঞান নেই। মাথার পিছন দিকটা রক্তে মাখামাখি।

একা সে। সরকার ভজহরি কোথায় বেরিয়েছে যেন। দেহাতী ঠিক-ঝিটিও তার দিনের কাজ শেষ করে একটু আগেই নিজের ঘরে চলে গেছে।

উপায় নেই। এখানে এভাবে লীলা স্বামীকে মরতে দিতে পারে না। প্রাপপণ চেষ্টায় সে অজয়ের নিস্পন্দ দেহটা দুহাতে টেনে তুলল। তারপর একরকম টানতে টানতেই নিয়ে এল ছাদের ওপর। অমানুষিক পরিশ্রমে কপাল দিয়ে তার স্বেদধারা ঝরে পড়ল। বুকের ভেতরটায় যেন হাপর টানার মতই হাঁফ। নিজেকে আর সে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারল না, লুটিয়ে পড়ল সে অজয়ের অচৈতন্য দেহটার পাশে।

মিনিটের পর মিনিট কেটে যায় যেন এক দুঃস্বপ্নের ভেতর দিয়ে। তারপর কোনরকমে টানতে টানতে অজয়কে এনে যখন তার ঘরের বিছানায় শুইয়ে দিল, বাইরে তখন অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে উঠেছে।

একসময় বাইরে পায়ের শব্দ পেতেই সে ছুটে বেরিয়ে গেল। সামনে ভজহরিকে দেখে ব্যাকুল কণ্ঠে বলল, ডাক্তার—একজন ডাক্তার ভজহরিবাবু—গাঁ থেকে একজন ডাক্তার এখুনি ডেকে আনুন। যেমন করে পারেন, যে করেই হোক।

ভজহরি প্রথমটায় হকচকিয়ে গেল। পরে দুর্ঘটনার বিবরণটুকু শুনে বলল, কিন্তু মা, আমি গেলে এই রাত্রে হয়তো ডাক্তার আসবে না। তাছাড়া অন্ধকারে আমার ভাল ঠাহরও হয় না চোখে।

তাহলে আমি নিজেই যাব। লীলা ব্যগ্রভাবে ভজহরির হাত দুটো চেপে ধরে বলল, আপনি একটু ওঁর কাছে থাকুন। আমাকে যেতে দিন। এভাবে একলা ফেলে রেখে তো আমি যেতে পারি না।

উদগত বাষ্পটি চাপতে চাপতে সে ছুটেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

.

বাইরের ঘরে বসে সমর তখন মাসকাবারী খরচের হিসেব করছে। সামনে বসে মায়া ফর্দ দেখে তারিখ মিলিয়ে বলে বলে যাচ্ছে, চাল লিখেছেন? তেরো টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা। আর ঘি দুকিলো তেরো টাকা হিসেবে ছাব্বিশ টাকা। নিন, যোগ করুন।

যোগটা সমর করল ঠিকই, কিন্তু মোট অঙ্কটা যা দাঁড়াল, সেটা দেখেই তার চোখে একটা কালো ছায়া নেমে এল! ম্লানভাবে হেসে বলল, সাতাত্তর টাকা চুয়াল্লিশ পয়সা। —হুঁ,—এ-মাসে মোট কত উপায় করেছি জানেন, মিস দে?

মায়া নিরীহের ভঙ্গিতে জবাব দিল, জানি, ডাক্তার রায়, সাত টাকা কুড়ি নয়া পয়সা।

হেসে উঠল সমর। হালকা সুরে বলল, তার মানে হচ্ছে, ঘাটতি সত্তর টাকা চব্বিশ

শুকনো ঠোঁট দুটো সে একবার জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নিল। কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল, মনে হচ্ছে, এখানে সুবিধে হবে না, মিস দে। পুঁজিপাটা তো শেষ। সামনের মাসে যদি মোটামুটি উপায় না করতে পারি, তাহলে এই গাঁ ছাড়তে হবে।

কথাশেষে একবার তির্যক দৃষ্টিতে মায়ার মুখের দিকে তাকাল। বোধ করি তার প্রতিক্রিয়াটা একবার দেখতে। কিন্তু এ ভীতিপ্রদর্শনে মায়ার মুখে কোন রেখাপাত ঘটল না। শান্তমুখেই সে কাগজপত্রগুলো গুটিয়ে উঠে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল, এবার খাবেন কি?

ঠিক সেই মুহূর্তেই ভেজানো বাইরের দরজাটা খুলে গেল। ঘরে ঢুকলেন লীলাকে নিয়ে পাণ্ডে। ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বললেন, ওই গিরমহল থেকে এই লেডি আপনার কাছে এসেছেন, ডাক্তার সাহেব।

লীলা তখন অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। কিন্তু সমরকে চিনতে পেরেই দাঁড়িয়ে পড়ল সে। চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল, সমরবাবু, আপনি?

সমর প্রথমটা তাকে ঠিক চিনতে পারেনি। পারল যখন, তখন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। পাংশু মুখখানার ওপর যথাসাধ্য পর্দা টেনে বিনীত ভঙ্গিতে বলল, বসুন, মিসেস সেন।

পাণ্ডে বোধ করি ইত্যবসরে অনেক কিছুই আন্দাজ করে নিলেন। আর একটি কথাও না বলে নিঃশব্দ পায়ে তিনি বেরিয়ে দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিলেন। মায়া ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল-দারুমূর্তির মতই।

লীলা কিন্তু বসল না। টেবিলের কিনারাটা চেপে ধরে আতঙ্ক বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সমরের মুখের দিকে।

সমর নিরুত্তাপ গলায় বলল, কিসের জন্য পদার্পণ ঘটল আমার এখানে জানতে পারি কি?

লীলা জিভ দিয়ে ঠোঁট দুটো বারকয়েক ভিজিয়ে নিল। ভগ্নকণ্ঠে ছাড়া ছাড়া ভাবে বলল, সমরবাবু—আমার স্বামী—মস্ত দুর্ঘটনা—ছাদ থেকে নীচে পাহাড়ে পড়ে গেছেন—অজ্ঞান হয়ে আছেন—একবার এখুনি যেতে হবে।

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধতা। তারপর সমর পেশাদারী গলায় বলল, আঘাতটা কোথায় পেয়েছেন?

মাথার পেছন দিকে—মনে হচ্ছে খুবই গুরুতর—অন্তত তিরিশ ফুট নীচে পাথরের ওপর পড়েছেন—

সমরের চোখ দুটো কুঞ্চিত হয়ে উঠল। বলল, আপনি কি আমাকে কেসটা হাতে নিতে বলছেন?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ডাক্তার রায়। আসুন আপনি। যত দেরি হবে ততই

সমর উঠে দাঁড়াল। সেই পেশাদারী গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল, হ্যাঁ, যাব বৈকি। আমি ডাক্তার, যেতে তো হবেই।

লীলা বোধ করি আর দাঁড়াতে পারছিল না। পাশের চেয়ারখানাতে বসে পড়ল। তার অবস্থা দেখে দ্রুত আসছিল সমর সাহায্য করবার জন্যে; কিন্তু তার আগেই লীলা আবার উঠে দাঁড়াল। অস্ফুট কণ্ঠে বলল, কিছু মনে করবেন না, ঠিক আছে। দয়া করে চলুন, দেরি করবেন না।

এবার সমর রূপান্তরিত হল পুরোদস্তুর চিকিৎসকে। গম্ভীর ভাবে বলল, না, আমি তৈরি—মায়া-মিস দে—আমার সার্জারি ব্যাগটা নিয়ে আসুন। আর যা কিছু দরকার একটা সুটকেসে ভরে নিন। কিন্তু মিসেস সেন, একজন নার্সেরও যে দরকার হবে?

নিশ্চয়ই, এ আর বলবার কি আছে।

তবে তুমিও তৈরি হয়ে নাও মায়া, যেতে হবে।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে মায়া নিজে তো তৈরি হয়ে নিলই, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ভরে নিল একটা সুটকেসে। চোখ দুটোয় তখন তার এক বিচিত্র আলো ঝকঝক করছে। জীবনে এই প্রথম তাকে সমর নাম ধরে ডেকেছে, তুমি সম্বোধন করেছে।

সুটকেসটা মায়ার হাত থেকে নিয়ে সমর লীলার উদ্দেশে বলল, চলুন, বেরিয়ে পড়া যাক, মিসেস সেন।

.

দীর্ঘক্ষণ ধরে সমর অজয়কে পরীক্ষা করল। মুখ তার ধীরে ধীরে কালো হয়ে উঠল। একসময় আচমকাই উঠে দাঁড়িয়ে সে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল। লীলা তাকে অনুসরণ করে এসে দাঁড়াল সেখানে। কতক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। শুধু নীরবে পরস্পরের

দিকে তাকিয়ে রইল। অবশেষে সমর মুখোশের মতই মুখে জানাল, জীবনের খুব বেশি আশা নেই। মাথার খুলিটা টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।

রক্তহীন বিবর্ণ মুখে লীলা আর্তনাদ করে উঠল, কোন আশা নেই!

খুব অল্পই। এভাবে পড়ে থাকলে বড়জোর আর বারো ঘণ্টা বাঁচতে পারে। তবে অপারেশন করতে পারলে

বেঁচে যাবেন?

একটু আশা করা যায়, যদিও খুব ক্ষীণ। খুলির হাড়গুলো বার করে নিয়ে আবার বসাতে হবে।

এখানে তার অসম্ভাব্যতা বুঝেই লীলা ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, অপারেশন না করতে পারলে তাহলে বাঁচবার কোন আশা নেই বলছেন?

মনে হয় তাই।

তাহলে আপনিই করুন না কেন?

সমরের মুখে কোন রেখাপাত ঘটল না। ধীর কণ্ঠে সে বলল, অতখানি ঝুঁকি কাঁধে নেবার মত সাহস আমার নেই।

কি কি বলতে চান?

অপারেশন যদি করতেই হয়, তাহলে স্ত্রী এবং নিকট আত্মীয়া হিসাবে আপনাকে লিখে দিতে হবে যে, আপনার বিশেষ অনুরোধেই আমি অপারেশন করছি। অস্ত্রোপচারের সঙ্গে যে জীবনহানির আশঙ্কা আছে, সেটা জেনে শুনে অনুরোধ করছেন আমায়—এটাও লেখা থাকবে।

লীলা বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে সমরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তার মনের ভেতর কি চিন্তা ক্রিয়া করে চলেছে, সেটাই পড়তে চায়। কিন্তু না, সমরের মুখ অপাঠ্য। অবসন্ন দেহে সে পাশের চেয়ারখানায়। বসে পড়ল। তারপর উদগত অশ্রু চাপতে চাপতেই লিখতে শুরু করল আমমোক্তারনামা।

সমর তার থেকে কাগজখানা নিয়ে মনোযোগ দিয়ে পড়ল। তারপর সেখানা ভরে রাখল প্যান্টের পকেটের ভেতরে। তারপর লীলার দিকে যখন সে আবার ফিরে তাকাল, তখন তার চোখে ফুটে উঠেছে বিজয়ীর দৃষ্টি, ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের বাঁকা হাসি।

কিন্তু কতক্ষণই বা! শল্যচিকিৎসা বিশারদে রূপান্তরিত হতে তার বিলম্ব ঘটল না। কণ্ঠে ফুটে উঠল পেশাদার সুলভ গাম্ভীর্য : একটা টেবিলের দরকার– হ্যাঁ, এটাতেই কাজ

চলতে পারে—গরম জল চাই- খুব বেশি করে- আপনাদের সরকার মশাই বোধ হয় সেটা করতে পারবেন—মোমবাতি আছে? মোমবাতি—অন্ত গোটা পঞ্চাশেক। পাশের ঘরে মায়ার উদ্দেশে হেঁকে বলল, মিস দে, তাড়াতাড়ি সব কিছু রেডি করে ফেলুন।

সেখান থেকে মায়া জবাব দিল, আমি তৈরি আছি, ডাক্তার রায়।

নিন মিসেস সেন, এবার টেবিলটা ধরুন দিকিনি, এটা ওঘরে নিয়ে যেতে হবে।

গায়ের কোটটা খুলে সে চেয়ারের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল। পকেট থেকে রুমাল বার করে ভাল করে মুছতে লাগল টেবিলটা। লীলা কোমর বেঁধে নিল তাকে সাহায্য করতে।

.

ঘরের চারিদিকে অসংখ্য বড় বড় মোমবাতি জ্বলে উঠল। উজ্জ্বল আলোয় ভরে উঠল ঘরখানা। না, তাতে অস্ত্রোপচারের বিশেষ কোন অসুবিধে ঘটবে না। ধরাধরি করে অজয়কে টেবিলের ওপর উপুড় করে শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল। কামিয়ে দেওয়া হয়েছিল মাথার চুলগুলো। মাথার যেসব জায়গায় চামড়াগুলো ফেটে ফেটে গিয়েছিল, সেগুলোয় তখন দলা দলা রক্ত।

পাশে আর এক টেবিলের ওপর অস্ত্রোপচারের সরঞ্জাম রাখা। পাশে দাঁড়িয়ে মায়া। ওপাশে লীলা দুহাত বুকে চেপে পাথরের মতই দাঁড়িয়ে। আর টেবিলের পায়ের দিকে

দাঁড়িয়ে ভজহরি গরম জলের পাত্র হাতে। বিশেষ একটি ছুরিকা হাতে তুলে নিয়ে সমর লীলার দিকে তাকাল। মুখখানা তার কঠিন—ভয়াল।

লীলা শিউরে উঠে চোখ ফিরিয়ে নিতেই সমর হুকুমের সুরে বলল, না, আপনার এখানে দাঁড়িয়ে না থাকাই ভাল।

পাশের ঘরে এসে লীলা একখানা চেয়ারের ওপর অবসন্ন দেহে বসে পড়ল। চিন্তাসূত্রগুলো জট পাকিয়ে গেছে মাথার ভেতর। চোখের দৃষ্টি শুন্য।

এক কোণে টেবিল ল্যাম্প একটা জ্বলছিল। হঠাৎ তার মনে হল সাদা দেয়ালের ওপর দুটি দেবদূতী ছায়া নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। শিউরে উঠে সে দুহাতে মুখ ঢাকল।

কতক্ষণ পরে আবার মুখ তুলল, দেখল, ডানা মেলে দুটো পতঙ্গ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাতিদানটার আলোক-শিখায়। মনে পড়ে গেল তার বাড়ির ইতিহাসটার কথা। দুটো পতঙ্গ যেন সেই দুই অশরীরী বন্ধু। ঘরের মধ্যে নেচে বেড়াচ্ছে।

বিভীষিকাময়ী রাত্রিও এক সময় শেষ হল। দেখা দিল দিনের আলো। যেন নতুন প্রাণের সাড়া। অজয় বিছানায় শুয়ে ছিল। মাথায় ব্যাণ্ডেজ। গায়ে সাদা চাদর একখানা গলা পর্যন্ত টানা। জ্ঞান তখনও তার পুরোপুরি ফিরে আসেনি। তাই সমর বিছানার পাশেই একখানা চেয়ারে বসে পরম আগ্রহে তাকিয়ে ছিল বন্ধুর মুখের দিকে।

লীলা শক্ত মুঠিতে কাঠের বাজুটা চেপে ধরে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। এই উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষা আর বুঝি সে সহ্য করতে পারে না। দম যেন তার বন্ধ হয়ে আসে। পাশের ঘর থেকে দেওয়াল-ঘড়িটা শুধু টকটক করে আওয়াজ করেই যেতে লাগল।

অকস্মাৎ অজয়ের চোখের পাতা দুটো একটু একটু কেঁপে উঠতেই সমর অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল, এবার বোধ হয় জ্ঞান ফিরবে।

লীলা প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল স্বামীর মুখের ওপর।

সত্যিই অজয়ের জ্ঞান ফিরে এল। ধীরে ধীরে চোখের পাতা মেলল সে। দৃষ্টিটা গিয়ে আটকে গেল সমরের মুখের ওপর। মৃদু অথচ জড়তাহীন কণ্ঠে সে বলল, কি রে সমর, স্বপ্নে আমি তোকেই দেখছিলুম।

সমর খুশি হল। মুখে তার জ্বলে উঠল হাজার বাতির আলো। বন্ধুর একখানা হাত চেপে ধরে বলল, অজয়কেও জয় করেছি তাহলে! লক্ষ্মী ছেলের মত আবার ঘুমিয়ে পড় দিকিন। তারপর যত ইচ্ছে স্বপ্ন দেখ!

বন্ধুর নির্দেশ অমান্য করতে পারল না অজয়। হাসিভরা মুখেই আবার চোখ বুজে ফেলল।

6

তখন অজয় নিদ্রিত। সুটকেসটা তুলে নিয়ে সমর উঠে দাঁড়াল। চুপি চুপি মায়াকে বলল, চলুন, আমরা বেরিয়ে পড়ি।

প্রায় দরজা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, এই সময় ছুটতে ছুটতে লীলা এসে ঘরে ঢুকল। সে যে চলে যাচ্ছে, বুঝেই একখানা হাত চেপে ধরল তার। কিন্তু কি যে বলবে, সেটা বুঝে উঠতে না পেরে নীরবে তাকিয়ে রইল।

সমরের চোখে ফুটে উঠল কঠিনশীতল দৃষ্টি। এক মুহূর্ত সেটা বদ্ধ হয়ে রইল লীলার মুখের ওপর। পরমুহূর্তে পরুষ কণ্ঠে বলল, আচ্ছা, নমস্কার।—তারপরই মায়ার একখানা হাত চেপে ধরে তাকে একরকম টানতে টানতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পাকদণ্ডীর পথ বেয়ে নামছিল তারা। সমর কি ভাবছিল কে জানে, অকস্মাৎ এক সময় সে হো হো করে হেসে উঠল। মায়া চলছিল পাশে পাশে, যদিও এখন আর হাতে হাত ধরা নয়। ভ্রূকুঞ্চিত করে সে তাকাল সঙ্গীর মুখের দিকে।

সমর কৌতুকের সুরে বলল, বড় বিচিত্র এই জগৎ, বুঝলেন, মিস দে? ওই ভদ্রমহিলাটিকে, আপনি হয়তো জানেন না, আমি একদিন ভালবেসেছিলাম। আর আমার বন্ধুটি ওকে আমার কাছ থেকে অপহরণ হ্যাঁ, অপহরণই করেছিল।

মায়া কোন জবাব দিল না। তবে তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, সে কি যেন একটা কৌতুক উপভোগ করছিল।

সমর সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল, কি জবাব দিচ্ছেন না যে?

আমি ভাবছি।

ভাবছেন? কি?

এমন কিছু নয়—এই এলোমেলো!

সমর চটে উঠল। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, এলোমেলো নয়। আমি জানি আপনি ভাবছেন, আমি কেন বন্ধুকে বাঁচিয়ে তুললুম। মেরে ফেলাটা অবশ্য কিছুই কঠিন ছিল না। মস্তিষ্কের মেডালায় ছোট্ট একটি খোঁচা আর তাতেই

আপনি সেটা করতে পারতেন না, ডাক্তার রায়।

পারতাম না? কিসে বুঝলেন?

মায়া হেসে ফেলল। আর ফেলেই মুখখানা ঘুরিয়ে নিল তার দিক থেকে।

এতে সমর আরো চটল। তীব্র কণ্ঠে বলল, হাসছেন কেন?

কই, না তো!

নিশ্চয়ই হাসছেন। হুঁ! কোন স্ত্রীলোকই সোজাসুজি কথা বলতে জানেন না। কিছু টিপে কিছু ঘুরিয়ে—আপনি কি বলতে চান লীলাকে আমি কোনদিন সত্যকার ভালবাসিনি?

না, না ডাক্তার রায়, এমন কথা আমি বলতেই পারি না। তবে—। একটু থেমে সে ভীরু কণ্ঠে বলল, তবে অজয়বাবুকেও তো আপনি ভালবাসেন?

সমর রুক্ষ কণ্ঠে বলে উঠল, বাসতুম। ওকে ভাবতুম, জগতের একমাত্র বন্ধু। কিন্তু সেসব অনেকদিন চুকে গেছে, মন থেকে মুছে ফেলেছি সব, বুঝলেন?

মায়া নিরীহের ভঙ্গিতে বলল, আপনি যখন বললেন, তখন মেনেই নিচ্ছি।

সমর আকাশের দিকে তাকিয়ে চোখ পাকাল, দাঁত কড়মড় করে বোধ করি দুনিয়ার স্ত্রীজাতটাকেই মনে মনে অভিসম্পাত দিল।

.

আরো দিন পনেরো কেটে গেছে। অজয় অনেকখানি সুস্থ হয়ে উঠেছে। এখন সে বিছানায় উঠে বসে কথাবার্তাও বলে। সমর দিনে দুবার তাকে দেখতে আসে। অবশ্য একান্তভাবে চিকিৎসক হিসেবে। অজয় যদি কখনো ঘনিষ্ঠভাবে পুরনো দিনের প্রসঙ্গ তোলে, সমর ধীর শান্তভাবে বন্ধুকে কিছু বুঝতে না দিয়েই সে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যায়।

সেদিনও সে এসেছিল। খাটের ওপর বসে ছিল অজয়। মাথার গোড়ায় দাঁড়িয়ে লীলা। সে গম্ভীরভাবে বলল, আমার দেখতে আসার আর কোন দরকার নেই। ইচ্ছে হলে আপনারা ফিরে যেতে পারেন।

সে উঠে দাঁড়াল। অজয় স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, লীলা, তুমি একটু পাশের ঘরে যাবে? আমি সমরকে গোটাকয়েক কথা বলব।

লীলা নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অজয় বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বলল, সমর, আয়, এখানে এসে বোস।

বিছানার পাশের চেয়ারটা সে আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিল। সমর কিন্তু বসল না, দাঁড়িয়ে রইল। অজয় মৃদু হেসে বলল, এতখানি দুর্বল না হয়ে পড়লে ঘাড় ধরে তোকে ওখানে বসিয়ে দিতুম।

সমর কোন কথা না বলে পাশের চেয়ারখানায় এসে বসল। তার কাঁধে একখানা হাত রেখে অজয় গাঢ় কণ্ঠে বলল, আমি অপরাধী, তা জানি রে, সমর। তোর সঙ্গে ছল-চাতুরী করার কোন প্রয়োজন ছিল না, সোজসুজি তোকে খুলে বলতে পারতুম। কিন্তু বিশ্বাস কর, তুই যে লীলাকে ভালবাসিস, আমি আগে তা জানতুম না। পারবি বিশ্বাস করতে?

সমর কোন জবাব দিল না। বুকের ভেতর একটা বাষ্প যেন তার ঠেলে ঠেলে উঠতে চাইল।

অজয় বলে চলল, লীলাকে আমি ভালবেসেছিলুম-পাগলের মত ভালবেসেছিলুম। আর কোন দিকে তাকাবার ফুরসৎ পাইনি। যদি ঘুণাক্ষরেও জানতুম তুই তাকে চাস, তাহলে তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করার আগে নিজের জিভটা উপড়ে ফেলতুম।

সমর কি যেন ভাবছিল। ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, আমি জানি, অজয়—অন্তত বোঝা উচিত ছিল।

অজয় বন্ধুর একখানা হাত চেপে ধরে উৎসাহ ভরে বলে উঠল, বল তাহলে, আজও আমরা সেই বন্ধুই আছি—যেমন আগে ছিলাম?

সমর বন্ধুর দিকে ফিরে তাকাল। তখন আর তার সেই অন্যমনস্কতাটা নেই। ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠেছিল অমলিন হাসি। অজয়ের একখানা হাত চেপে ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিত বলল, ভুল আমিই করেছি রে। কিন্তু উনি করেননি, ঠিকই বুঝেছিল।

উনি? মানে লীলা?

সমর শুধু আর-একদফা হাসল। মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করল, কবে নাগাদ যেতে চাস তাহলে?

তোদের ওপরই তো সেটা নির্ভর করছে। তোর আর লীলার।

তাহলে ওঁর ওপরই ছেড়ে দে। আচ্ছা— উঠে দাঁড়াল সমর।

অজয় ব্যগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে, তুই কি এখানেই থাকতে চাস?

হ্যাঁ। আচ্ছা, আজ চলি। আর দেরি করব না, হঠাৎ এক জরুরী কাজের কথা মনে পড়ে গেল। যাবার জন্যে সে পা বাড়াল।

অজয় ডাকল, সমর, শোন—

সমর ফিরে তাকাল। অজয় মিনতি করুণ কণ্ঠে বলল, লীলুর সঙ্গে বোঝাপড়াটা শেষ করে নিবি না? ওকে ভালবাসাটা যে কি, সেটা আমি বুঝি রে! যদি বিদায় নিতে গিয়ে একবার ওকে বুকেও টেনে নিস, আমি কিছু মনে করব না।

বা! স্বামী হিসেবে আদর্শ তুই? হা হা করে হেসে উঠল সমর। পরক্ষণে হেঁট হয়ে চুপি চুপি বন্ধুর কানে কানে বলল, আমি আর একজনকে বুকে টেনে নিতে চাইরে! যত তাড়াতাড়ি হয় তত ভাল। এখন যাচ্ছি, আবার বিকেলে দেখা হবে।

ঘূর্ণী হাওয়ার মতই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আর অজয় তাকিয়ে রইল বন্ধুর গমনপথের দিকে।

.

এ কটা দিন মায়া অনেক ব্যথাই পেয়েছে। অকারণেই যেন সমর বার বার রূঢ় হয়ে উঠেছে তার ওপর। আর বুঝি সে সহ্য করতে পারে না। তাই মনে মনে সে স্থির করেছিল ভাগ্যের পাশা নিয়ে শেষবারের মত সে খেলতে বসবে। যদি দান দিতে ভুল হয়, জীবনে আশা করার মত আর কিছু থাকবে না। কিন্তু যদি সে ভুল না করে

সমর এসে ঘরে ঢুকল। দেখল মায়ার জিনিসপত্র সব বাঁধাছাঁদা। বড় সুটকেসটার ওপর সে বসে।

ধীর পায়ে মায়া উঠে দাঁড়াল। কিছু একটা হয়তো সে বলতে গেল, কিন্তু মুখ দিয়ে কথা ফুটল। শুধু ঠোঁট দুটো বারকয়েক কেঁপে উঠল।

অসহ্য বিস্ময়ে সমর বলে উঠল, কি ব্যাপার? হঠাৎ

আমি চলে যাচ্ছি, ডাক্তার রায়।

চলে যাচ্ছেন? সমরের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল,কেন? কোথায়?

হাতব্যাগটা তুলে নিতে নিতে মায়া ছাড়া ছাড়া ভাবে বলল, শহরে। এক বন্ধু চিঠি লিখেছে। হয়তো হাসপাতালে চাকরিটা পতে পারি।

কথাশেষে একখানা খাম সে সমরের দিকে বাড়িয়ে ধরল।

খামে লেখা নামটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে, সমর সেখানা প্রায় ছিনিয়ে নিল মায়ার হাত থেকে। তারপর সেখানা পকেটে ভরতে ভরতে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, ভগবানকে ধন্যবাদ দিন যে, চিঠি যিনি লিখেছেন, তিনি আপনারই মত একটি মেয়ে—পুরুষ নন। আসুন না এদিকে

মায়া ধীর পদে এগিয়ে এল। মুখোমুখি দাঁড়াল দুজনে। যেন এখুনি একটা কলহের ঝড় উঠবে। মায়ার চোখে উদ্ধত দৃষ্টি।

দেখেও ভ্রূক্ষেপ করল না সমর। কৈফিয়ৎ চাওয়ার ভঙ্গিতে বলল, আমায় বেঁধে দেবে কে, খাওয়াবে কে, সেবা যত্ন করবে কে?

মায়া ঢোক গিলল। সমরের যে দৃষ্টিতে ছিল বজ্রগর্ভ বিদ্যুৎ, তাতেই ফুটে উঠল হাসির রূপালি রেখা। তার প্রতিক্রিয়া বুঝি দেখা দিল মায়ার মুখেও। সে হেসে ফেলল।

সমর অকস্মাৎ দুহাত বাড়িয়ে তাকে শুন্যে তুলে নিল, তারপর মুখখানা নামিয়ে আনল নিজের মুখের ওপর। অস্ফুট কণ্ঠে বলতে লাগল বারবার, চলে যাবে? যাও তো!

মায়ার একখানা হাত স্বতঃই উঠে এসে সময়ের কণ্ঠ বেষ্টন করল।

সমর তাকে নিয়ে কি ভাবে যে আদর করবে ভেবে পাচ্ছিল না। তার বুকে মুখ গুঁজে ছেলেমানুষের মত বলে চলল, লীলাকে আমি সত্যিকার ভাল কোনদিনই বাসিনি-আমার সব ভালবাসা ছিল অজয়ের ওপর, তাই আমি ভুল বুঝে তার ওপর রাগ করেছিলুম, ভেবেছিলুম ও আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাই আমার মন ভেঙে গিয়েছিল।

বিচিত্র এক মোহময় আনন্দে মায়ার সর্বাঙ্গ যেন অবশ হয়ে আসছিল। কাঁপা গলায় সে বলল, কিন্তু তোমাদের মধ্যে আমার ঠাঁই কোথায়?

তোমার ঠাঁই এই অন্তরে—যেখানে তুমি একমাত্র সম্রাজ্ঞী।

আর একবার সে তার মুখখানা নামিয়ে আনল মায়ার মুখের ওপর। ঠিক সেই সময় বাইরের কড়া নড়ে উঠল। ভেসে এল পাণ্ডে সাহেবের গলা : ডাংদার সাব!

মায়াকে বাহুবেষ্টনে বেঁধেই সমর ছুটতে ছুটতে গিয়ে পেছনের ঘরে ঢুকল।

সদর দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন পাণ্ডে। বললেন, একটা মেটারনিটি কেস

কিন্তু ঘরে কাউকে না দেখে মাঝপথেই তিনি থেমে গেলেন। একজন দেহাতী লোক সঙ্কুচিত পায়ে তাঁর পেছনে পেছনে ঘরে এসে দাঁড়াল।

সমর তখন পেছনের ঘরে মায়ার কানে বলছে, তোমাকে যে ভালবাসি, সেটা টের পেয়েছিলুম কবে জান, মায়া? যেদিন কলকাতায় নিজের চেম্বারে ফিরে এসে তোমাকে দেখেছিলুম ঠিক এমনিভাবেই নিজের সুটকেসের ওপর চুপচাপ বসে থাকতে।

কারো সাড়াশব্দ না পেয়ে পাণ্ডে তখন দেহাতী লোকটিকে বলছেন, আশ্চর্য! পাঁচ মিনিটও হয়নি, ডাংদার সাবকে আমি কোঠিতে ঢুকতে দেখিয়েসি—। গলা পরিষ্কার করে নিয়ে তিনি এবার উচ্চকণ্ঠে ডাকলেন, ডাংদার সাব।

হয়তো ভেতরের ঘরের দিকেই এগিয়ে যেতেন তিনি, কিন্তু মেঝেয় পড়ে থাকা সুটকেসটায় হোঁচট খেলেন।

সমর তখন মায়ার হাত ধরে টানতে টানতে পেছনের দরজা দিয়ে একফালি বারান্দাটায় এসে পড়েছে। একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে মায়াকে সে বললে, তোমাকে বলতেই হবে– বল আমাকে কখন ভালবেসেছিলে?

মায়া সলজ্জ জবাব দিল, যেদিন তোমায় প্রথম দেখেছিলুম, সেই হাসপাতালে।

মুখ দিয়ে একটা শীৎকার ধ্বনি করেই সমর তাকে বুকে টেনে নিল। আবার মুখের ওপর মুখ।

দূর থেকে তখন পাণ্ডের ক্ষীণ কণ্ঠ ভেসে আসছে : ডাংদার সাব! কোথায় আপনারা?

চোখ বন্ধ করে সমর ধ্যানমগ্নের মতই দাঁড়িয়ে ছিল। অস্ফুট কণ্ঠে বলল, স্বর্গে!